KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর ওসমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol & Number : ৫৩/৩ ৫৩/৪ ৫৩/৫-৬ ৫৩/৮	Year of Publication : আষাঢ় ১৩৯৯ // July 1992 শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৯৯ // Aug 1992 ভাদ্র-কার্তিক ১৩৯৯ // Sep-Oct 1992 অগ্রহায়ণ ১৩৯৯ // Dec 1992 (i)
	Condition : Brittle · Good
Editor : আব্দুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯২

প্রজ্ঞায় এবং মনুষ্যত্বে অসাধারণ এক মানুষ আর তাঁর কৃতি নিয়ে ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ আলোচনা— 'স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে অনন্য গোপাল হালদার'।

আমাদের মাতৃসমা যে-মৃত্তিকা তার সংকটাপন্ন অবস্থা নিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মৃৎবিজ্ঞানী ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক সন্দর্ভ 'মাটি'।

ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশগুলি বিচার-বিবেচনা প্রসঙ্গে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার অতি সংকটাপন্ন রূপ প্রকটিত হয়েছে প্রাক্তন আইনমন্ত্রী সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সমালোচনায়।

ক্ষেত্র-সমীক্ষাজাত অভিজ্ঞতায় আরও সমৃদ্ধ 'জাত বৈষ্ণব কথা'-র অন্তিম অংশ।

অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা পর্ব নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রসঙ্গে ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের দীর্ঘ আলোচনা।

গ্রন্থ সমালোচনার অন্যান্য বিষয়— 'ধর্মান্ধতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা', 'আত্মকথায় হেমচন্দ্র গুহ', 'হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ', 'সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস' ইত্যাদি।

উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতি ও জাতীয় স্বার্থ ডাঙ্কেল প্রস্তাবে কীভাবে বিঘ্নিত হতে চলেছে তাই নিয়ে প্রাঞ্জল আলোচনা।

একটি তৌলন আলোচনা : চিত্রকলা, সঙ্গীত, কাব্য ও ভাস্কর্য—লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।

জন্মশতবর্ষে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে লিখেছেন সন্তোষকুমার দে।

Premier Sprinkler Systems
A Total Tea Irrigation Plan

The Premier 'total-tea-irrigation-plan' means the best irrigation system with specialized equipment engineered at the lowest capital cost for your garden.

Sprinklers

Spray water gently and evenly. Exclusive sealed bearings to ensure years of continuous reliable operation.

Coupling Valves

New and exclusive to Premier Systems. Sprinklers are moved and reconnected easily and quickly. Less labour. More irrigation.

Pipelines

Flexible and strong. Fastest coupling and uncoupling. Best water sealing.

Pumpsets

More reliable. More economical.

Soil Moisture Meter

Helps you control irrigation. Maximize production with minimum water.

Premier Service

Highly trained expert team who survey and analyse before proposing the Premier Sprinkler System best suited to your garden. Backed by prompt and comprehensive after-sales-service.

Premier Irrigation—not just a complete system, a complete service.

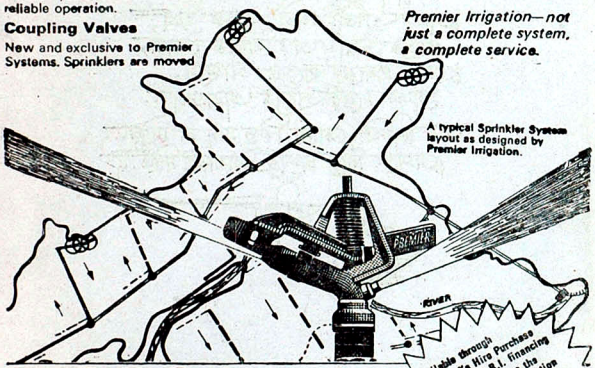

Available through Tea Board's Hire Purchase Scheme and I.D.B.I. financing facilities. In addition to the normal annual I.T. depreciation deduction, a 25% deduction as investment allowance is permitted in the year of installation.

PREMIER IRRIGATION EQUIPMENT LIMITED

Plantation Irrigation Department
17/1C, Alipore Road, Calcutta 700 027
Tel : 45-7455/7626/5302

বর্ষ ৫৩ সংখ্যা ৮

ডিসেম্বর ১৯৯২

অগ্রহায়ণ ১৩৯৯

স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে অনন্ত গোপাল হালদার শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ৪৯৪

মাটি সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৫০৪

ড. অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশ প্রসঙ্গে কিছু কথা সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ ৫২৫

কবিতা

ঝরা কুসুম ফিরে আয় শান্তিকুমার ঘোষ ৫০০

আসা রফিক উল ইসলাম ৫০১

শান্তিনিকেতন চিরপ্রশান্ত বাগদী ৫০২

ইচ্ছে কি কোন কাকতাড়ুয়া অনিন্দ্য সেন ৫০৩

গল্প

ওজো সুশীলকুমার সিংহ ৫১২

ধারাবাহিক রচনা

জাত বৈষ্ণব কথা অজিত দাস ৫৩৪

গ্রন্থ সমালোচনা

একটি সাংবাদিকসুলভ নির্ভার বিবরণী অরবিন্দ পোদ্দার ৫৪৪

পশ্চিমবঙ্গে কোণঠাসা শ্রমিক আন্দোলন এবং ভোটরঙ্গ প্রসঙ্গে পুলকনারায়ণ ধর ৫৪৬

ধর্মান্ধতা এবং ধর্মনিপেক্ষতা শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪৯

আত্মকথায় হেমচন্দ্র গুহ সনাতন মিত্র ৫৫২

সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস সুকুমারী ভট্টাচার্য ৫৫৪

মাতৃভাষায় আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান অশোকেন্দু সেনগুপ্ত ৫৫৬

হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ সুরজিৎ দাশগুপ্ত ৫৫৮

অর্থনীতি

ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থ সন্মথনাথ ঘোষ ৫৬০

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম শতবার্ষিকী সন্তোষকুমার দে ৫৬৪

চিত্রকলা

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ভাবনায় চিত্রকলা শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ৫৬৭

মতামত

লীলা রায় / কোরআনে নারীর মর্যাদা / শম্ভু মিত্র এবং প্রচার মাধ্যমের অবহেলা ৫৬৭-৫৭৫

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক পি এম বাকৃচি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৬
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলি-১৩ দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭

শিল্প পরিকল্পনা রণেনআয়ন দত্ত নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

জাতীয় সংহতি

"...ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্রক্ষেত্রে সত্য-সাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ন্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।"

.....রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

.....আই. সি. এ...4590.....

স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে অনন্য
গোপাল হালদার

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

প্রথিতযশা নৃতত্ত্ববিদ্ এবং আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে তারকেশ্বর লাইনের লোকাল ট্রেনে যাচ্ছিলাম। সালটি মনে আছে উনিশশো পঁয়ষট্টি। মনে থাকার কারণ ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মশত বর্ষ পূর্তির এক অনুষ্ঠানে সতীশচন্দ্রের গ্রামে গিয়েছিলাম। ১৯৬৫ সালের জুন মাস। ট্রেনে যেতে যেতে নানা আলোচনায় সময় কাটছে। মাঝে মাঝে তর্কও করে ফেলছি। কথায় কথায় নির্মলবাবু বললেন, 'ব্রাহ্ম আন্দোলন নিয়ে যতই মাতামাতি করা হোক-না কেন, ব্রাহ্ম সমাজ এদেশে কখনোই যথার্থ শিকড় পায় নি, যেমন পায় নি তোমাদের কমিউনিস্টরা।' সেই বয়সে এর পরে চুপ করে থাকা যায় না। প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলে বসলাম, 'রবীন্দ্রনাথও তো ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠেছেন, আপনি কি বলতে চান রবীন্দ্রনাথও দেশের মাটির সঙ্গে যুক্ত নন? আর গোপাল হালদারও তো কমিউনিস্ট। আপনি কি বলবেন তিনিও rooted to the soil নন অর্থাৎ মাটিতে শিকড় পান নি?' নির্মলবাবু শান্ত কণ্ঠে জবাবে বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি নন, আর গোপালবাবুও একেবারে স্বতন্ত্র, তোমাদের আর দশজন কমিউনিস্টদের চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র।' গান্ধীবাদী নির্মলবাবুর কাছে একথা শুনে সেদিন আর কথা বাড়াই নি। ভাবতে বসেছিলাম গোপাল হালদার কোথায় স্বতন্ত্র। সেই লোকাল ট্রেনে বসেই মনে পড়ছিল গোপালবাবু বলেছেন, দুপুরের ইলেকট্রিক ট্রেনে হাওড়া-বাণ্ডেল যাতায়াত তাঁর এক বাঞ্ছিত বিলাস। 'অপরিচিত মানুষদের মধ্যে চলি একা, দুচোখ ভরে বাইরের পৃথিবী দেখি, দুকান ভরে শুনি যাত্রীদের কথা। নানা বয়সের, নানা জাতির, নানা ভাষার।' এই নিঃসঙ্গতার সুযোগে নিজেকে অন্তরালে রেখে বহুজন সঙ্গের আয়োজন থেকেই কি গোপালবাবুর স্বাতন্ত্র্যের শুরু? আমাদের পরিচিত এক খ্যাতিমান ব্যক্তির পিতা তাঁর পুত্রকে কৈশোরে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 'কমিউনিস্টরা তর্ক করে বেশি, কিন্তু দেখে কম। বুদ্ধিমান বটে, তবে হৃদয়ের ব্যাপারে ওদের কিছু অভাব আছে।' কিন্তু যে-গোপাল হালদারের ইলেকট্রিক ট্রেনে হাওড়া-বাণ্ডেল যাতায়াত এক বাঞ্ছিত বিলাস, তিনি তো তর্কমুখর নন, দেখার আগ্রহেই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই গোপাল হালদারই রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করে বলতে পারেন, 'রূপনারানের কূলে / জেগে উঠিলাম ; / জানিলাম, এ জগৎ / স্বপ্ন নয়।'

কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল অর্থাৎ কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির নাম এই প্রজন্মের কাছে হয়তো তেমন পরিচিত নয়। জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রাথমিক খ্যাতি এই পার্টির সূত্রেই। সেই দলের সম্পাদক ছিলেন ইউসুফ মেহের আলী। ইনি রুচি আর সৌজন্য বোধের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, নইলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো রাজনীতি-নিরাসক্ত মানুষের সান্নিধ্যে আসতেন না। রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃস্মৃতি *On the Edges of Time* গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন ইউসুফ মেহের আলীকে। সেই মেহের আলী গোপাল হালদারের জীবনে

প্রহেলিকার আভাস পেয়েছিলেন, 'কলেজে পড়েছিল ইংরেজি সাহিত্য, গবেষণা করেছিল বাঙলা শব্দতত্ত্ব, আর এসে ঠেকছে মজদুর আন্দোলনে—ব্যাপারটা আশ্চর্য নয় কি ?' গোপাল হালদার শুধু স্বতন্ত্রই নন, আশ্চর্যও। ইউসুফ মেহের আলীর মতো রাজনীতির মানুষের কাছেও আশ্চর্য।

গোপাল হালদার স্বতন্ত্র—ব্যক্তিত্বের আভিজাত্যে নয়, আশ্চর্য পাণ্ডিত্যের অভিমানে নয়। তবু তিনি স্বতন্ত্র—এবং আশ্চর্য। ব্যক্তিত্বের আভিজাত্যে স্বতন্ত্র গোপাল হালদার নিজের কলেজ জীবনের সহপাঠীদের মধ্যেই দেখেছেন। তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। গোপালবাবুর সঙ্গে পাঁচ বছর এক সঙ্গে পড়েছিলেন। তখনো তিনি সাহিত্যে প্রকাশিত হন নি। 'কিন্তু তখনি তিনি আপন ব্যক্তিত্বে স্বপ্রকাশ। …ইংরেজ সুলভ উচ্চারণভঙ্গি, তদপেক্ষাও আত্মপ্রত্যয়-সমৃদ্ধ কণ্ঠ, যেন গভীর এক ঘোষণা।…তাঁর কণ্ঠস্বর, শব্দোচ্চারণ, বাগ্‌ভঙ্গি কৃত্রিম হলেও মনে হত ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। ক্লাসের পড়ায় সুধীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল না, ছিল রঙ্গমিশ্রিত নিস্পৃহতা।… ক্লাসের বাইরে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব অচিরেই বহু সহপাঠীকে আকর্ষণ করে।' যদিও গোপাল হালদার কিছুটা সঙ্কোচ-বশে, কিছুটা আত্মসচেতনার কারণে এই ব্যক্তিত্বের থেকে একটু দূরেই থাকতেন। যখন অনেকেই সুধীন্দ্রনাথের 'ব্যক্তি মহিমায় আকৃষ্ট, তাঁর বাক্-মহিমায় উৎফুল্ল, সেই আভিজাত্য-অভিমানের আনুষঙ্গিক পার্শ্বচর।' সহপাঠী সুধীন্দ্রনাথকে 'অদ্বিতীয়' বলে মনে হলেও জন্ম-অভিজাত সুধীন্দ্রনাথকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর চরিত্রে পিতার মনীষার সঙ্গে পিতৃব্যের অভিনয়পটুতাও যুক্ত। ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য যেমন গোপাল হালদারের অম্বিষ্ট ছিল না, তেমনি পাণ্ডিত্যের অভিমানও নয়। নইলে একদা সহকর্মী নীরদ চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রেখেও নিস্পৃহ থাকতেন না। যাঁর সম্বন্ধে প্রায় ৬৫ বছর আগে তিনি মনে করতেন, 'কলম তো নয়, এ যেন বিদ্যার, বুদ্ধির, রুচির বাক্‌বৈদগ্ধ্যের শাণিত তরবারি।' যদিও গোপালবাবুর ধারণা, 'বাঙালির রুচিতে, নীতিতে, বুদ্ধিতে বিশ্বাস তখনো তিনি রাখতেন না।' যদিও ব্যক্তিগতভাবে এই দুর্জয় মেধাবী মানুষটির সঙ্গলাভ গোপাল হালদার মনে করতেন তাঁর 'অপরিমিত সৌভাগ্য'। সেই নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনী *Thy Hand Great Anarch*এ গোপালবাবুর বারংবার উল্লেখ করেছেন ঠিকই, তবে সে উল্লেখে যেন খানিকটা দূরত্ব থেকে গেছে। পরবর্তীকালের একটি অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর রচনায় স্মৃতিবিভ্রম বা তাঁর কাছে প্রেরিত ভুল তথ্যের ভিত্তিতে গোপাল হালদারকে Late বা স্বর্গীয় বলে উল্লেখ করেছেন। গোপালবাবু স্বাভাবিক কারণেই তাঁর তথাকথিত স্বর্গপ্রাপ্তি নিয়ে কোনো প্রতিবাদপত্র পত্রিকায় বা লেখকের কাছে পাঠান নি। বরং স্মিতহাস্যে বলেছিলেন, 'এত জানেন তিনি, এইটুকু না-জানা ধর্তব্যের মধ্যেই না।' পাণ্ডিত্যের অভিমান নীরদচন্দ্রের মধ্যে কী পরিমাণ আছে তা তাঁর রচনাতেও প্রকট। আর গোপালবাবু নীরদচন্দ্রের প্রতি তাঁর সানন্দ কৃতজ্ঞতা আজও ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত নন। যে চল্লিশ বছর এই দুই ভিন্ন মেরুর মানুষের মধ্যে নিকট সান্নিধ্যে কেটেছে তার সৌহার্দ্য, সৌজন্য, আন্তরিক সহানুভূতিকে তিনি অবিস্মরণীয় সম্পদ জ্ঞানেই স্মরণ করেছেন। এমন স্বীকৃতি কিন্তু নীরদ-চন্দ্রের কাছ থেকে কল্পনা করা যায় না। সে কি শুধু তিনি তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তিত্বের সন্ধান জীবনে পান নি বলে, না এও এক ধরনের পাণ্ডিত্যের অভিমান !

গোপাল হালদারের স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি অন্যত্র—না আভি-জাত্যে, না পাণ্ডিত্যে। ইউসুফ মেহের আলী যে আশ্চর্য হয়েছিলেন ইংরেজি সাহিত্য, বাংলা শব্দতত্ত্ব এবং মজদুর আন্দোলনের অসম সংমিশ্রণে, তিনিও ধরতে পারেন নি সেই স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিটি। গোপাল হালদার একদা বলেছিলেন, 'সাধারণ মানুষের অসাধারণতা আর অসাধারণ মানুষেরও সাধারণতা আমাদের এ শতাব্দীর একটা বড়ো আবিষ্কার।' কথাটাকে ঘুরিয়ে ধরলে এটাকেই গোপাল হালদারের স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ ভিত্তি বলে মনে করা যেতে পারে। গোপালবাবু অসাধারণ হয়েও সাধারণ থেকেছেন, আবার সাধারণ থেকেই তিনি অসাধারণত্বে পৌঁছেছেন। তিনি যখন বলেন, 'আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হয়েছে মানুষের মুখ। সাধারণ মানুষের, অসাধারণ মানুষের, সকল মানুষের।…অর্থাৎ সবার উপরে মানুষ সত্য।' তখন বুঝতে পারি এ তাঁর নিছক আবেগোচ্ছল উক্তি নয়, আলঙ্কারিক বা Rhetoric নয়, যদিও গোপালবাবু আবেগ-বর্জিত নন বা রেটরিকে তিনি কখনও লেখেন না তা নয়—এ তাঁর জীবনানুভূতির কথা, যে সত্য তিনি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অর্জন করেছেন, যা আজও নবতিবর্ষ অতিক্রান্ত গোপাল হালদারের সান্নিধ্যে এলে সব থেকে আগে মনে হয় —একটি মানুষ যিনি তাঁর জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করেন নি। জীবনের সব দেখা, সব কাজ, সব চেনা জানা তাঁকে আজও সমৃদ্ধ করে চলেছে। এইখানেই ইউসুফ

মেহের আলীর বিস্ময় এক গভীর ভালোবাসায় পরিণতি লাভ করে। গোপালবাবুর জীবনে মনে হয় বর্জন নেই, আছে গ্রহণ, বিচার এবং স্বীকরণ। সে গ্রহণ বা স্বীকরণে বিচার বুদ্ধিবর্জিত ভক্ত বিনয়ীর বিগলিত আত্মসমর্পণ নেই, তাঁর জীবনের আদর্শ থেকে তাঁকে বিরত করার সাধ্য কারও নেই। আজও তাই তাঁর আদর্শের সঙ্গে সংগতি নেই এমন বিবৃতিতে তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহ করা যাবে না। অথচ তাঁর চিন্তাভাবনা থেকে বহুযোজন দূরবর্তী মানুষের সঙ্গে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আলাপ আলোচনায় ক্লান্তি বা অনীহা নেই তাঁর। গুরু সুনীতিকুমারের মতোই তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠে বলতে পারেন, 'মানুষের সঙ্গে যুক্ত কোনো কিছুতেই আমার অনাগ্রহ নেই।'

পঞ্চাশ বছর আগের কথা, অনেকের হয়তো মনে পড়বে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ ছাই রঙের পাতলা মলাটের ঠিক আড়াইশো পৃষ্ঠার একখানা বই বেরিয়েছিল, নাম 'সংস্কৃতির রূপান্তর।' এ বই এদেশে মার্ক্সীয় সাহিত্য-অনুরাগীদের কাছে এক অপরিহার্য গ্রন্থ। অনিল কাঞ্জিলাল বলেছিলেন, 'মার্ক্সবাদী গোপাল হালদারের সর্বপ্রথম মহৎ কীর্তি তাঁর "সংস্কৃতির রূপান্তর"—যা বাংলা ভাষায় এখনো মার্কসীয় সাহিত্যের একখানি অনন্য ক্লাসিক। ১৯৪০-৫০-এর দশকে বহু তরুণ এই বই পড়ে মার্কসীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।' এ বই প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সরোজ দত্ত লিখেছিলেন, 'একদিকে যেমন দায়িত্বজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অভাবে উগ্র বামপন্থীগণ অতীতকে স্বল্পবিদ্যায় বিকৃত করিয়া একেবারে বর্জনই করিতে চাহিয়াছেন…অন্যদিকে তেমনই একদল অতিপণ্ডিত অতীতকে নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া নির্বোধ আসক্তির সহিত আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিতেছেন। এই দুই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার মোহ হইতে শিক্ষিত ও শিক্ষাপ্রয়াসী বাঙালিমনকে মুক্ত করিবার জন্য…শ্রীযুত গোপাল হালদার এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন।…"সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারের পুনরাবর্তন নয়, সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন।"… ভারতীয় সংস্কৃতির এই সমাজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বাংলাদেশে গোপালবাবুকেই একরূপ প্রথম পথপ্রদর্শক বলা চলে।…যে পাণ্ডিত্য, পরিশ্রম, সংযম…নিরভিমান প্রাঞ্জলতায় এই আড়াইশত পৃষ্ঠার গ্রন্থে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে পাঠকমাত্রেই বুঝিবেন, সাম্যবাদীগণ দায়িত্বহীন ও পাণ্ডিত্য-হীন 'পলিটিক্যাল এজিটেটর' মাত্র নহেন, তাঁহাদেরও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় এবং বড়ো বেশি প্রয়োজন হয়।' 'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রকাশের ছ বছর বাদে রাধারমণ মিত্র লিখেছিলেন, 'সংস্কৃতি, বিশেষ করে বাঙালি সংস্কৃতি, গোপাল বাবুর একান্ত আপনার জিনিস—প্রাণের জিনিস। তার জন্য শুধু যে তাঁর দরদই আছে তা নয়, মাথাব্যথাও আছে।' আর লেখার অধিকার ? সে তো আছেই। প্রমাণ, 'সংস্কৃতির রূপান্তর'। 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এই গোপাল হালদার আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'কমিউনিজম এ-যুগের মানবতার নাম।' গোপাল হালদার সেদিন সাহস করে বলেছিলেন, 'মানুষের জীবন-সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি।…সাধারণভাবে আমরা যেমন মনে করি, কালচার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত তাহাও যেমন একটি অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যেমন মনে করি কালচার মানে কাব্য, গান, চারু-কলা, বড়ো জোর দর্শন পর্যন্ত, তাহাও তেমনি আর একটি অর্ধসত্য।' বিশ্বছন্দের সঙ্গে দেশকে মিলিয়ে দেখতে হবে একথাও গোপাল হালদার বললেন, 'ইতিহাস পয়ার ছন্দে লেখা পাঁচালী নয়, ইতিহাস অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহা-ভারত। তাহার ছন্দের মিল পঙ্‌ক্তির অভ্যন্তরে ; সূক্ষ্মতর নিবিড়তর সেই মিল। মানব-ইতিহাসের সেই বিরাট ছন্দের সঙ্গে এদেশের ইতিহাসের ছন্দটিও মিলাইয়া পড়িতে হইবে।'

'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালের সেপ্টে-ম্বর মাসে। রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য প্রয়াত। কয়েকমাস আগে গোপাল হালদার যোগ দিয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। কাজ শুরু করলেন কৃষক সভায়। অর্থাৎ তাঁর নিজের জীবন চিন্তায় স্পষ্ট রূপান্তর ঘটে গেছে। তবে সেটাও আকস্মিক কিছু নয়। 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর ভূমিকা জে. বি. এস. হলডেনের উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করেছেন, 'A Marxist must not be too afraid of making mistakes ?' নিজের মার্কসবাদী পরিচয় নিয়ে আর সংশয় নেই। তবে তার আগের অধ্যায় কি শুধু ভুল, যে ভুল করতে একজন মার্কস্‌বাদীর ভয় পাবার কথা নয়। যখন বলেন, 'দেশ ও কাল নিয়েই আমি। ১৯১৬ সাল থেকে বিপ্লবী দলে ঢুকেছি, বিবেকানন্দ তাকে বোধন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ শোধন করেছেন। তখন ১৯১৮ সালের মধ্যভাগ —প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয় নি। রুশ বিপ্লব অবশ্য কয়েক

মাস আগেই ঘটেছে। বুঝতে চাইলেও তার স্বরূপ তখনো বুঝতে পারছি না। রাশিয়ায় জারের পতনের সংবাদে আনন্দিত হলাম। ধনী দরিদ্রে সাম্য স্থাপিত হচ্ছে, আরও উৎফুল্ল হয়েছি তা পড়ে।…মনে মনে বলশেভিকদের পক্ষপাতী হয়ে পড়লাম।' তখনও কিন্তু বলশেভিক 'সম্পূর্ণ অপরিচিত নাম, সম্পূর্ণ অজানা মতবাদ।…নানা খবরের রাজা আমার দাদা রঙ্গীন হালদার। বলশেভিক কথাটার অর্থ তিনিও জানেন না।' তথাপি যখন জানা গেল 'এদেশের শাসক ব্রিটিশ কর্তারা বলশেভিকদের বিষম বিরোধী। তা হলেই হল।' তারই ফলে 'সোৎসুক জিজ্ঞাসা ও শ্রদ্ধা' নিয়ে তখন থেকেই পথে চলেছেন। ১৯৩২ সালে ছ বছরের জন্য কারাবাস করেছেন, তারপরেও তিন বছর কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকার পর, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ছেড়ে আসতে বাধ্য হবার পর, ১৯৪১ সালের পয়লা জানুয়ারি, একেবারে নতুন বছরের শুরুতে পার্টির কাছে সদস্যের আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। ওই ছ বছরের কারাবাসই প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঠ গ্রহণের কাল। জেলের মধ্যেই মার্কসবাদের চর্চা শুরু হয়েছে। দেখেছেন আবদুর রেজ্জাক খাঁ এবং ধরণী গোস্বামীর মতো কমিউনিস্টদের। ক্রমে এই সিদ্ধান্তে এলেন, 'কমিউনিজম এ যুগের মানবতাবাদ।' এই বোধহয় 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এ পৌছনোর ইতিহাস।

তবে এই স্তরে পৌছনোর আর এক ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছেন গোপাল হালদার। প্রবন্ধে বা রম্য রচনায় নয়। উপন্যাসে—এক অভিনব পদ্ধতিতে লেখা উপন্যাসে। 'একদা' থেকে 'আর একদিন' তারই সাক্ষ্য বহন করে। 'একদা'র দিনটি হল আটাশে অগ্রহায়ণ, তেরশো সাঁইত্রিশ সাল অর্থাৎ ১৯৩০ সাল। এই তারিখ নির্বাচন হয়তো আকস্মিক, হয়তো আকস্মিক নয়। অমিতের কথা বুঝতে গেলে ১৯৩০ সালটা নিশ্চয়ই জরুরি। হঠাৎ মনে পড়ে যায় গোপাল হালদারের পিতা সীতাকান্ত হালদারের মৃত্যু তারিখ ১৯৩২-এর ২৮শে মার্চ। আর গোপালবাবু প্রথমবার জেলে গেলেন একমাসের মধ্যেই ১৯৩২ সালের ২৪শে এপ্রিল। যাকে তিনি বললেন, 'আমার যৌবন পেল রাজটীকা।' 'অন্যদিন'-এর দিনটি হল ১৯৩৭-৩৮ সালের একটি দিন। গোপালবাবু ৩৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে জেল থেকে বাইরে এলেন। তাই মনে হয় 'একদা' আর 'অন্যদিন'-এর ভিতর দিয়েই তিনি এসে পৌছলেন 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এ। ব্যক্তিজীবন আর দেশপরিবেশ দুটি দিনের সাক্ষ্যে কেমনভাবে একাকার হয়ে গেল। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮ এই উনিশ বছরের যৌবনের ইতিহাস তিনটি দিনের ছবিতে ধরা পড়ে গেল। এ ছবি একদিকে দিয়ে যেমন একটি যুবকের আত্মজিজ্ঞাসা, অন্যদিক দিয়ে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের এক অনিবার্য বিবর্তন। লেখক তাঁর নায়ককে সম্বোধন করে তাই বলেন, 'মানুষ আজ শিখিতেছে নিজেকেই রচনা করিবার বিদ্যা। ইহাই এ যুগের দৃষ্টি, ইহাই এ যুগের সৃষ্টি।…এ দায়িত্ব হাতে তুলিয়া লও তোমরা, অমিত।' অনিবার্য ভাবেই অমিত বহুবচনাত্মক 'তোমরা'য় পরিণত হয়। যার ফলে অমিতকে চিনতে আর কোনো বাধা থাকে না পাঠকের। গোপাল হালদারও হয়ে ওঠেন তিরিশ থেকে পঞ্চাশে পৌছনো রাজনৈতিক চেতনা-বিবর্তনের এক প্রাণচঞ্চল সার্থক প্রতিনিধি।

১৯৪১ সালে 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর উৎসর্গে বলা হয়েছে 'বাঙালা দেশের যে যুগ আজ শেষ হইয়াছে তাহার সংস্কৃতির শুভ্র ও সানন্দ প্রকাশ' লেখক প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর প্রয়াত পিতার জীবনে। আজ বিংশ শতাব্দীর প্রান্তে এসে গোপাল হালদারের দিকে চেয়েও মনে হয় বাংলাদেশের যে আরেক যুগ আজ শেষ হতে চলেছে তার সংস্কৃতির শুভ্র ও সানন্দ প্রকাশ যেন গোপাল হালদার। শুভ্রও বটেন, সানন্দও বটেন। গত জুলাই মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি অনুষ্ঠানে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গোপালবাবু উপস্থিত হয়েছিলেন—সেই ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা পাতলা চাদরে সানন্দ সহাস্য, যে-বেশে যে-মেজাজে তাঁকে কলকাতার পথে জনসভায় চল্লিশোত্তর কাল থেকে অনেকেই দেখেছেন। বিজাতীয় পোশাকে গোপালবাবুকে দেখা যায় না তা নয়। বিদেশ ভ্রমণকালে এবং কখনও তাঁর নিজের বৈঠকখানায় সে পোশাকেও তাঁকে দেখা যায়। কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্তের চরিত্র তাতে কখনও ঢাকা পড়েছে বলে মনে হয় না। পোশাক তো বাইরে। মোহিতলালের সঙ্গে 'প্রবাসী'র দপ্তরে একদিন তর্ক উঠেছিল যথার্থ বাঙালির স্বরূপ নিয়ে। বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগরের মতো যথার্থ বাঙালি হতে চাই। …বিদ্যাসাগর চাল-চলনে বাঙালি আর জীবন-দৃষ্টিতে যুগধর্মী।' ইনিই গোপাল হালদারের আদর্শ। ইনিই এই শতকের যুগ প্রতিনিধি। সেই বাঙালি আর কতদিন থাকবেন? অপস্রিয়মান বাঙালি পোশাক আর ক্ষীয়মাণ বাঙালি চাল-চলন-মেজাজ-ভাবনা-চেতনার দিকে চেয়ে মনে হয় গোপাল হালদার কি তাঁর স্বাতন্ত্র্যে নিঃসঙ্গই হয়ে

পড়লেন? ইউরোপীয়রা এক সময় মনে করতেন তাঁদের দুটি বাড়ি—একটি তাঁর জন্মভূমি, আর একটি পারী। দেশবিভাগ-পূর্ব বাঙালিদেরও ছিল তাই, একটি দেশ-ঘর, আর একটি কলকাতা। গোপাল হালদারের ভাষায়, 'জমিজমা দূরে থাক বাড়িঘরও আমাদের নেই। বিক্রমপুরের বাড়ি পদ্মাগর্ভে, নোয়াখালির বাসাবাড়ি মেঘনার উদরে। থাকি কলকাতায় ফ্ল্যাটের ভাড়াটে। এই সঞ্চরমাণতাই গোপাল হালদারের কালের বৈশিষ্ট্য, যা আজকের মানুষের কাছে একটু বিস্ময়ের ব্যাপার। সেই কাল এবং সেই দেশকে চিনতে পারা যায়, যখন গোপাল হালদার তাঁর জন্মকথা বলেন, 'আমি যখন জন্মালাম তখন পাড়ায় একটা ঘড়ি পাওয়া যায় নি। গ্রামবৃদ্ধরা সময় ঠিক করলেন—'কতক্ষণ আগে কোরাল পাখি ডাক দিয়েছিল।' তারপর 'কত ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা শোনা…রূপনারায়নের পথে…জীবনে জীবন দিয়ে শেখায়। বর্জনে নয়, গ্রহণে, কেবলই সজাগ গ্রহণে'। তাই তিনি বিক্রমপুর-নোয়াখালির 'বাঙাল' হয়েও কলকাতার মানুষ। কোনোটিকেই ছাড়েন নি, আবার কোনোটিতেই গ্রস্ত হন নি। এঁরাই কি বাঙালি সমাজের অন্তিম প্রতিনিধি যাঁরা বাঙালি থেকেও বিশ্বমানবিকতায় স্বাভাবিক দীক্ষা নিয়েছেন—কোনোটিকে অস্বীকার করে নয়, কিন্তু সকল সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে, অথচ আপন মাটিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে। গোপাল হালদার প্রমুখরাই কি last of of the Mohicans?

নির্মলবাবু যে অর্থে গোপালবাবুকে 'স্বতন্ত্র' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, সে হল তাঁর 'ক্যাথলিক' চরিত্র। গোপাল হালদার এক অর্থে সত্যিই ক্যাথলিক বা উদারচিত্ত। ক্যাথলিক কিন্তু 'কম্প্রোমাইজিং বা আপসকামী নন। উদারতা আছে তাঁর চিত্তে, তাই বলে বিনা তর্কে কিছু মেনে নেবার মানুষ নন গোপাল হালদার। জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ থেকে লেনিন সকলের কাছ থেকেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন। প্রত্যেকের সম্বন্ধেই শ্রদ্ধা রেখেছেন অটুট। বিদ্যাসাগর আর বিবেকানন্দ তাঁকে অনেক প্রেরণা যুগিয়েছেন। আর রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর আরাধ্য দেবতা বললেও কম বলা হবে। তথাপি লেনিনই জীবনের ধ্রুবতারা—সমাজতন্ত্র, সোভিয়েত, স্তালিন এবং স্তালিনোত্তর সোভিয়েত সম্বন্ধে সমালোচনা বজায় রেখেও। সেখানেও ক্যাথলিক। দুটো ত্রুটি দেখালেও পাঁচটি সদর্থক প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। পার্টি বিভক্ত হবার পরেও মুজফফর আহম্মদ সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করতে শুনেছি—সে তো কেবল সন্দীপ-নোয়াখালি সাযুজ্যের কারণে নয়। এই চরিত্র-ঔদার্য তাঁর সঙ্গে সুনীতিকুমারের সম্পর্ককে কোনো দিন চিড় খেতে দেয় নি। সুনীতিকুমার তাঁর গবেষক-ছাত্র গোপাল হালদারের রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না তা নয়। তবু সুনীতিকুমার সম্বন্ধে তাঁর বলতে বাধে নি যে, 'গবেষণার গুরু ছাড়াও তিনি আমার অনেক বিষয়ে শিক্ষার গুরু, অনেক জিজ্ঞাসার উদ্‌বোধক'। সুনীতিকুমার গোপাল হালদারকে যে কোনো অবস্থাতেই ভুল বোঝেন নি তার প্রধান কারণ গোপালবাবু রঙ্গীন হালদারের ভাই। রঙ্গীনবাবু সম্বন্ধে সসম্ভ্রম ধারণা পোষণ করতেন না এমন মানুষ এ সমাজে কেউ ছিলেন না। চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সবটুকুই যে রঙ্গীন-গোপাল হালদারের কৃতিত্ব, তা নয়। সুনীতিকুমারের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের খবরও অনেকে রাখেন না। সুনীতিকুমার ছিলেন জাতশিক্ষক। রাজনীতির সঙ্গে যে পরোক্ষ যোগ ঘটেছিল সে তো জীবনের অন্ত্যপর্বে। তার পূর্বে তাঁর মধ্যপর্বে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ক্ষণিক উন্মোচন তাকেও গোপালবাবুর চোখে ভালো ঠেকার কথা নয়। তবু তিনি যে সুনীতিকুমারের পরিচয় পেয়েছেন সে একেবারে ভিন্ন। ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বৃত্তি নিয়েছিলেন সে তো শুধু সুনীতিকুমারের কাছে কাজ করবার সুযোগ পাবেন বলে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে এর বছর তিনেক আগে। তাঁর প্রথম গবেষণাজাত নিবন্ধ ছাপা হয় ১৯২৯ সালেই সেই সুনীতিকুমারেরই উদ্যোগে। সুনীতিকুমার গোপালবাবুর দ্বিতীয় নিবন্ধ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে ছাপতে দেন, তখন গোপালবাবু জেলখানার অতিথি। গবেষক-ছাত্রের কারাবাসে সুনীতিকুমারের খুশি হবার কথা নয়। তবু তাঁকে জেলখানায় বই পাঠিয়েছেন, চিঠিতে নির্দেশ নিয়েছেন, এমন কি প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে সাক্ষাৎ করে আলোচনাও করেছেন সুনীতিকুমার। বোধ হয় এ কারণেই গোপাল হালদার সুনীতিকুমারের প্রতি আজও গভীর শ্রদ্ধাশীল। আজও দুটি পরিবার যেন আত্মীয়ের মতো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। অথচ বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণের প্রশ্নে গোপাল হালদার প্রকাশ্যে গুরুর বিরোধিতা করেছিলেন। তাতেও আত্মিক সম্পর্ক

নষ্ট হয় নি—আজকের দিনের বিচারে এটা বুঝতে গেলে আমাদের কিঞ্চিৎ ধাঁধায় পড়তে হয়। তার কারণ চারিত্রিক ঔদার্যের প্রশস্ত পথটি ক্রমেই সংকীর্ণ এবং উপলসঙ্কুল হয়ে পড়ছে। হয়ে পড়ছে বলেই সুনীতিকুমার-গোপাল হালদার সম্পর্ক তো বটেই, গোপাল হালদারের সঙ্গে অনিল কাঞ্জিলাল বা রাধারমণ মিত্র বা মহাদেবপ্রসাদ সাহার সম্পর্ক হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বাস করানো কঠিন হয়ে পড়বে।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার নোয়াখালি উপভাষা নিয়ে গবেষণা থেকে শুরু করে 'সংস্কৃতির রূপান্তর' পর্যন্ত তাঁর বিচিত্র রচনাসম্ভার সত্ত্বেও গোপাল হালদার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কোন্ প্রাথমিক পরিচয়ে থেকে যাবেন? গোপাল হালদার সাংবাদিক, তা নিয়ে এখনও তাঁর মনে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ আছে। যাঁরা তখন পড়েন নি তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরদিন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত তাঁর রচিত সম্পাদকীয় *It Was His City* প্রসঙ্গে আনুপূর্বিক বলতে ভালোবাসেন। শুধু সেই সম্পাদকীয়ই নয়, 'প্রবাসী'র 'বহির্জগত' এবং 'দেশ-বিদেশের কথা'ও অনেকের মনে পড়বে। আনন্দবাজার পত্রিকার চাকরি যখন ছাড়বেন বলে সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে জানান তখন সুরেশবাবু আন্তরিকভাবেই বলেছিলেন যে 'গোপালবাবুর এ সিদ্ধান্ত ভুল।' গোপাল হালদার গবেষক, তার অভিজ্ঞান তো স্বয়ং সুনীতিকুমারের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। সুনীতিকুমার চেয়েও ছিলেন গোপালবাবুকে গবেষণা কর্মে। কিন্তু তিনি সুনীতিকুমারের আশা পূরণ করতে পারেন নি। গোপাল হালদার ঔপন্যাসিক। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে অন্তত তেরোখানি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে খানচারেক বাংলা উপন্যাস আলোচকরা কোনোদিন এড়িয়ে যেতে পারবেন বলে মনে হয় না। তাঁর একদা-অদ্যদিন-আর একদিন এবং উনপঞ্চাশী-তেরশ পঞ্চাশ-পঞ্চাশের পথ বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। গোপাল হালদার প্রাবন্ধিকও। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' তো তাঁর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর বিচিত্র রচনাগুলি বিষয়ানুক্রমে সাজিয়ে একটু বেছে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধ হবে। তবু এই সব পরিচয়ই গোপাল হালদারের ক্ষেত্রে 'এহো বাহ্য'। গোপাল হালদার কমিউনিস্ট, মার্কস্‌বাদের এক বিদগ্ধ তাত্ত্বিক। এ পরিচয়ই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিমণ্ডলে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাঁর বৈঠকখানায় এখনও যাঁরা প্রায়শ হাজির থাকেন তাঁদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই না হলেও পঁচাশি জন নিঃসন্দেহে নানা রঙের এবং নানা ঢঙের মার্ক্‌সবাদ-সম্পৃক্ত রাজনৈতিক মানুষ। তাঁরা নানা সূত্রে যে সব প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে আসেন তার সঙ্গে মার্ক্‌সবাদের কিছু-না-কিছু সম্পর্ক থেকেই যায়। তাই মার্কসবাদের প্রসঙ্গে আজও গোপাল হালদার নিশ্চিতভাবে প্রাসঙ্গিক। আর আজকের মার্ক্‌সবাদীদের কাছে প্রশ্নের তো অবধি নেই। চারিদিকে প্রশ্ন, সমস্যা, সংকট। সবাই অল্পবিস্তর নিরাশাগ্রস্ত। গোপাল হালদারকে এমনই এক প্রশ্ন করলে তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠে এক আশ্চর্য আত্মপ্রত্যয়ের সুর ফুটে উঠল। বসে ছিলেন ইজি চেয়ারে। দাঁড়িয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের মতো তো বলতে পারব না—মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ, সেই আত্মবিশ্বাস কোথায় নিজের মধ্যে। তবে যতটুকু বুঝেছি, যতটুকু দেখেছি তাতে বলতে চাই, মানুষ হেরে যাবে তা কখনও হতে পারে না। মানুষের জয়, মানুষের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। এত ত্যাগ, এত সংগ্রাম সব ব্যর্থ হয়ে যাবে, তা কি কখনও হতে পারে? এই বিশ্বাস নিয়েই আছি দীর্ঘকাল। এই বিশ্বাস নিয়েই থাকব, আছি যত কাল।'

এই কথা শুনব বলেই গোপালদার কাছে যাই। যেতে হবে। যেতে চাই বার বার অনেক দিন।

ভাষাতাত্ত্বিক ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সাহিত্য অকাদেমির প্রাক্তন রিজিওন্যাল জেনারেল সেক্রেটারি এবং বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর সম্পাদকমণ্ডলীর সচিব।

ঝরা কুসুম ফিরে যায়

শান্তিকুমার ঘোষ

ঝরা কুসুম
উড়ে ফিরে যায় তার বৃন্তে—প্রশাখায়···
রঙিন প্রজাপতি।
আমার আছে খামার-বাড়ি
বড়ো শহরের অনতিদূরে।
সবুজ গাঁয়ে মেলে মহুয়ার নির্যাস;
ঝলকিত নগরে গিয়ে শুনি
আগ্নেয়-সংগীত।
পৃথিবী ঘুরে খুঁজতে হয় না মনের মানুষ,
হাত বাড়ালেই আসে বন্ধু।
মহানিম গাছের তলায় বসে রাখালদের পাঠশালা;
সত্র থেকে বিলোয় অমৃতধারা।
ঝরা কুসুম যায় ফিরে যায় তার বৃন্তে···
একটি প্রজাপতি।

আসা

রফিক উল ইসলাম

এভাবেই আসেন সমুদ্রতীরে, একা। ঘোর বৃষ্টি নামে তখন। বিনিদ্র
ডালপালা ঝুঁকে পড়ে। স্বপ্নে জেনেছি তাঁর বৈভব। লোকশ্রুতির মতন
উত্তরীয়। কাঁপা কাঁপা দেওয়াল, অস্বচ্ছ মশারী তিনি ছুঁয়ে থাকেন
সমস্ত রাত। কখনো তুমুল জ্যোৎস্নায় গলে গলে নামেন।

পরিচয়ের পর মোহভঙ্গ হলো। আমাদের অজস্র আকাশের কথা তিনি
জানতেন না। আমাদের গোপন নারীরা কিভাবে উচ্চর, তাও তাঁর
অজানা। দিনের শেষে যখন সমস্ত আলো নিভু নিভু, দিকভ্রান্ত তিনি।
আমি তাঁকে চেনালুম অদূরস্থ বটগাছ, রাজবাড়ির পথ। পথের পাশে
মুকুটমনিপুর···

এভাবেই আসেন। বিদগ্ধ রাজসভা থেকে ঐশ্বর্য নিয়ে আবার ফিরে
যান মহিমায়!

শান্তিনিকেতন

চিরপ্রশান্ত বাগদী

সি এণ্ড্রুজ পল্লী এলাকায় ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি
উটজের নীচে নেপালী তরুণ-তরুণীর গানে গড়ে উঠল আনন্দভুবন
ঝরে পড়ল শাদা-ওলঞ্চ বেগুনী-জারুল আর ঈষৎ হরিৎ-আমলকি

এইসব দৃশ্য আজ তীব্রতম গতিতে ছুটে যাচ্ছে মৃৎ-প্রতিমার দিকে
প্রতিমার শরীরে গড়ে উঠছে বাসন্তিক শিমুল-পলাশ-মহুয়ার জঙ্গল
নীল আকাশ ভরে উঠছে যেন আগুনের লাল-হলুদ শিখায়
আধুনিক শবরী সে-বর্ণ ও তজ্জাত গন্ধের ভিতর একা ব্রতবদ্ধ

মৃন্ময়, চিন্ময় হয়ে তারপর শবরীর ব্রত ভেঙে ফুলের ভিতরে
গড়ে অন্যপৃথিবী।

ইচ্ছে কি কোন কাকতাড়ুয়া ?

অনিন্দ্য সেন

অনন্ত কোন ইচ্ছে বশে
কথার পিঠে কথার
জাল বুনতে গিয়ে কান-জড়ানো
চশমা-ডাঁটি আলটপকা
নাকের ডগায় !

জিওল-কই ইচ্ছেটাকে
'জলাভূমি'র দূষণ-বিষে
যায় না তবু পৌঁছে
দিতে—যেথায় আছে স্বপন দে-র
কেওড়াতলা !

ইচ্ছে তবু কথার তোড়ে
বানভাসি হোক দিক্‌বিদিক
ইচ্ছে জোরে ফাঁদা-কথা
নতুন কিছু বলব না তা
তবু যেন নিরেট-মাথা পোকায়-কাটা
বই-পড়ুয়া—এমন শাদা
সত্য কথায় সামনে যদি ভূত দেখে
কি কাকতাড়ুয়া !

সেই আশাতেই ইচ্ছে বশে
কথার পিঠে কিছু কথা···

মাটি

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিশদ আলোচনা

মাটির রং, গ্রথন, গঠন, তৈরি পদ্ধতি, জল ধরার এবং ছাড়ার ক্ষমতা, জীবাণু, জৈবপদার্থ, ক্ষয় ও দূষণ নিয়ে মোটা দাগের একটি চিত্র আঁকা হয়েছে। এগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনার মধ্য দিয়ে মাটির বৈজ্ঞানিক চিত্রটি ফুটে উঠবে।

রং

মাটির যে দুটি উপাদান রং-এর জন্য প্রধানত দায়ী তা হল লোহা ঘটিত কয়েকটি মৌল, বিশেষ করে বিভিন্ন আর্দ্রতা-যুক্ত আয়রণ অকসাইড এবং জৈব পদার্থ। ছাই, কালো এবং বাদামি রং-এর মাটিতে অবশ্যই জৈব পদার্থ থাকবে। জৈব পদার্থ মাটির উর্বরতার পরিচায়ক। আয়রণ অকসাইড-এর উপস্থিতিতে মাটির রং হলদে, লাল এবং বাদামি হতে পারে। যেখানে জারণ ক্রিয়া প্রবল সেখানে লালমাটির প্রাধান্য দেখা যায়, কারণ সম্পূর্ণ জারিত আর্দ্রতাবিহীন আয়রণ অকসাইড-এর রং লাল। জৈব পদার্থের সঙ্গে মিশ্রণে মাটির রং কালো বা বাদামি হয়ে থাকে। আংশিক জারিত অবস্থার আয়রণ অকসাইড এবং অবশিষ্ট জৈব পদার্থ মিলিত হলে মাটির রং কৃষ্ণাভ ও বাদামি হতে পারে। অতএব কেবল মাটির রং দেখেই সম্ভাব্য বিক্রিয়ার সম্পর্কে জানা যায়।

মাটির রং-এর আপাত গাঢ়তা আর্দ্রতার উপর অংশত নির্ভর করে। শুকনো মাটির রং হালকা, কিন্তু জলের সংস্পর্শে গাঢ়তর মনে হয়। সুতরাং মাটির রং বিচার করতে গিয়ে মাটি ভিজে না শুকনো উল্লেখ করতে হয়। চলতি ভাষায় রং-এর বিবরণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়না। এই জন্য একটি রং-এর চার্ট তৈরি হয়েছে। আবিষ্কর্তার নামে বলা হয় ম্যুনসেল চার্ট। বিভিন্ন অনুপাতে লাল ও হলুদ এবং তার সঙ্গে কালো রং মিশিয়ে অনেকগুলি মিশ্রণ তৈরি করা যায় যাদের গাঢ়তা ও আভা বিভিন্ন। চার্টের যে কোন একটি রং-এর সঙ্গে মাটির রং প্রায়ই মিলে যাবে, না গেলেও খুব কাছাকাছি হবে। মাঠে সাধারণত মাটি ভিজে থাকে—সেখানেও চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে মাটির রং নির্ণয় করা যায়। সেই অবস্থায় ভিজে মাটির রং বলে উল্লেখ করতে হবে। রোদে শুকোনো সম্ভব হলে শুকনো মাটির রং-ও চার্টের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। অতিক্ষুদ্র কণাবিশিষ্ট মাটি বেশি পরিমাণে জল টানে, অতএব ভিজে অবস্থায় তার রং গাঢ়তর দেখায়। হালকা গ্রথনের বালি কিংবা পলি মাটি তুলনায় হালকা রং-এর হবে। অতএব মাটির রং বিচার করে গ্রথন সম্পর্কেও আন্দাজ করা যায়।

মাটির গড় নমুনা

মাটিতে যে কঠিন বস্তুটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রধানতম অংশ এসেছে শিলা থেকে, সামান্য অংশ এসেছে জৈব পদার্থ থেকে। শিলা-ঘটিত অংশটিতে আছে নানা আয়তনের কণাসমষ্টি। তাদের পারস্পরিক অনুপাত জেনে গ্রথন নির্ণয় করা হয়।

মাঠে যে মাটির নমুনা পাই, অল্প পরিসরেও তার মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। অতএব একটি গড় নমুনা নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মাঠের মাটি থেকে গড় নমুনা লাভের পদ্ধতিটি এইরূপ :

যে কোন মাঠকে দশ হাজার বর্গমিটার আয়তনে কাল্পনিক ভাগ করা হয়। প্রতি কুড়ি মিটার দূরে পনের সেন্টিমিটার একটি গর্ত খুঁড়ে তার উপরের, নিচের এবং চার ধার থেকে অল্প পরিমাণ মাটি সংগ্রহ করে একটি থলেতে রাখা হল। এইভাবে নির্বাচিত স্থানটির চার ধার থেকে অনুরূপ মাটি সংগ্রহ করা হল। তারপর কোণাকুণিও প্রতি কুড়ি-মিটার দূরে দূরে মাটি সংগ্রহ করা হল। সংগৃহীত মাটির নমুনাগুলি একটি বড়ো থলেতে রাখা হল। যদি মাঠটির পরিসর খুব বড়ো না হয় তা হলে আপাত দৃষ্টিতে মাটির নমুনাতে বিভিন্নতা দেখা যাবে না। যদি বিভিন্নতা লক্ষ করা হয় তা হলে অন্য একটি থলেতে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে

পৃথক নমুনা-মাটি সংগ্রহ করা উচিত। সংগৃহীত মাটি রোদে শুকোবার জন্য কাগজের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হল। সম্পূর্ণ শুকোলে মাটিকে ভালোভাবে হাতে করে মিশিয়ে একটি বর্গ আয়তনে সাজানো হল এবং চার সমান ভাগে ভাগ করা হল। কোণাকুণি দু ভাগ রেখে বাকি দু ভাগ ফেলে দেওয়া হল। রাখা অংশটি পুনরায় ভালোভাবে হাতে করে মিশিয়ে চার ভাগ করে, কোণাকুণি দু ভাগ রেখে বাকি দু ভাগ ফেলে দেওয়া হল। রাখা অংশটি পুনরায় ভালোভাবে হাতে করে মিশিয়ে চার ভাগ করে, কোণাকুণি দু ভাগ রেখেবাকি দু ভাগ ফেলে দেওয়া হল। যখন মাটির পরিমাণ দুই কিংবা তিন কিলোগ্রামে পৌঁছেছে তখন এই নমুনাটি একটি কাঠের তৈরি হামানদিস্তায় অল্প চাপে বড়ো বড়ো দানাগুলোকে ভালো করে গুঁড়ো করা হল। অতঃপর একটি দুই মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত ছাঁকনিতে ঢেলে দেওয়া হল। দুই মিলিমিটারের অধিক ব্যাসযুক্ত কণাগুলি ছাঁকনিতে ধরা পড়ল। যে অংশ ধরা পড়ল না সেই অংশই হল মাটির গড় নমুনা। এই গড় নমুনা মাটি নিয়েই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলে। এই জন্য নমুনা তৈরির পদ্ধতিটি সযত্নে পালন করা অত্যাবশ্যক।

গ্রথন

গ্রথন সম্পর্কে গুণগত ধারণালাভের পদ্ধতিটি সহজ বটে কিন্তু মাত্রাগত তথ্যলাভের পদ্ধতিটি কিছু জটিল, নির্ণয় করতে সময়ও লাগে বেশি। সাধারণত নানাবিধ আয়তনের কণা-সমষ্টিকে তিনটি অথবা চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। ক্ষুদ্রতম হচ্ছে কাদাকণা অনধিক 0·002 মিমি ব্যাসের ; পরবর্তী বৃহত্তর আয়তনের 0·002-0·02 মিমি গ্রুপকে বলা হয় পলি ; 0·02-0·2 মিমি গ্রুপ হল মিহি এবং 0·2-2 মিমি হল মোটা বালি। গ্রথন নির্ণয়ের জন্য মিহি ও মোটা বালিকে একসঙ্গে ধরা হয়।

নমুনা-মাটিতে বিভিন্ন আয়তনের কণাগুলি দানা বেঁধে থাকে। দানা বাঁধার কাজে জৈব পদার্থ এবং চুণা পাথর জাতীয় বস্তু সাহায্য করে। দানাগুলি না ভাঙলে কাদা, পলি এবং বালির প্রকৃত পরিমাণ জানা যায় না। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে চুণা পাথর জাতীয় যৌগ-গুলিকে দ্রবীভূত করা হয়। এই বিক্রিয়ায় কাদামাটির সঙ্গে যুক্ত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি আয়নগুলিও মাটি থেকে আলাদা হয়ে যায়। অতিরিক্ত অ্যাসিড জলে ধুয়ে ফেলে জৈব পদার্থকে জারিত করা হয় অল্পতাপে হাই-ড্রোজেন পার-অকসাইড-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এমনি করে দানাবদ্ধ কণাগুলি আলাদা হয়ে যায়। অতঃপর সামান্য কষ্টিক সোডার দ্রবণ যোগ করা হল, যাতে এক ফোঁটা ভাস-মান মাটিতে এক ফোঁটা ফিনল্থ্যালিন দিলে লাল হয়ে যায়। এই অবস্থায় কাদা কণাগুলি স্বতন্ত্রভাবে ভাসমান থাকে। এই পর্যায়ে মাটির নমুনাকে একটি লম্বা সিলিণ্ডারে স্থানা-ন্তরিত করে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল ঢেলে দেওয়া হল। কয়েক-বার ঝাঁকানি দিয়ে সিলিণ্ডারটি দাঁড় করিয়ে দিলে দেখা যাবে ক্রমশ মাটির কিছু অংশ নিচে থিতিয়ে পড়ছে এবং কিছু অংশ ভাসমান থাকছে। বলা বাহুল্য, ক্ষুদ্র আয়তনের কণাগুলিই ভাসমান থাকবে এবং বড়ো আয়তনের কণাগুলি নিচে জমা হবে। হিসাব করে বলা যায় যে বালি পলি এবং কাদাকণা উপর থেকে সিলিণ্ডারের নির্দিষ্ট একটি বিন্দুতে পৌঁছুতে কত সময় নেবে। বালিকণা এত দ্রুত নিচে পড়তে থাকবে যে তাদের আলাদা করতে উপযুক্ত ছিদ্রযুক্ত ছাঁকনি ব্যবহারই শ্রেয়। কাদা কণা সবচেয়ে বেশি সময় নেবে, তুলনায় পলি নেবে খুব কম সময়। মাত্রাগত তথ্য পেতে হলে নমুনা মাটি সহ সিলিণ্ডারের উচ্চতা, আয়তন এবং জলের পরিমাণ সঠিক জানা চাই। ধরা যাক্ দশগ্রাম মাটি নিয়ে শুরু করে এক লিটার সিলিণ্ডারে ঐ পরিমাণ জল দিয়ে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে থিতোতে দেওয়া হল। তাহলে কাদাকণাগুলির দশ সেমি পড়তে সময় লাগবে প্রায় আট ঘণ্টা। সেই তুলনায় পলিমাটির লাগবে মাত্র সাড়ে চার মিনিট। অতএব বালি (মিহি এবং মোটা) ছেঁকে নেওয়ার পর এক লিটার জল ভরা সিলিণ্ডারটাকে যদি স্থির ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, তা হলে আট ঘণ্টা পরে দশ সেমি মার্কা পর্যন্ত কাদাকণা ভাসমান অবস্থায় থাকবে। এবার একটি নির্দিষ্ট ঘন আয়তনের (25 মিলি) পিপেটের সাহায্যে ঐ পরিমাণ ভাসমান কাদাকণা একটি পাত্রে তুলে নেওয়া হল। অতঃপর ঐ পাত্রটি 105° সে. তাপকামরায় রেখে দিলে জল বাষ্পীভূত হয়ে যাবে এবং পাত্রে পড়ে থাকবে শুকনো কাদামাটি। এর থেকে দশ গ্রাম নমুনা-মাটিতে কত কাদা অংশ আছে, সহজেই হিসাব করা যায়। এবার সিলিণ্ডারের জলের পরিমাণ এক লিটার পূর্ণ করে, সাড়ে চার মিনিট বাদে দশ সেমি পর্যন্ত ভাসমান অংশ ফেলে দেওয়া হল। সাড়ে চার মিনিটে পলি অংশ নিচে জমা হবে। এই ভাবে কয়েকবার কাদা অংশ ফেলে দেওয়ার পর দেখা যাবে যে ভাসমান অংশ আর বাকি নেই। এই

অবস্থায় সিলিণ্ডারের নিচে জমা পলি মাটির অংশ একটি পাত্রে নিয়ে 105° সে শুকিয়ে ওজন জানা হল। এই ভাবে কাদা, পলি ও বালির (মিহি ও মোটা) আনুপাতিক পরিমাণ জানা যাবে। বিজ্ঞান সম্মতভাবে গ্রথনকে ব্যক্ত করার জন্য কাদা, পলি এবং বালির শতাংশ একটি সমভুজ ত্রিকোণ গ্রাফে প্রকাশ করা হয়। এই গ্রাফের এক একটি অংশকে কাদা বা এঁটেল, পলিকাদা, দো-আঁশ, কাদা দো-আঁশ, পলি দো-আঁশ, বালি বা বেলে, দো-আঁশ বালি ইত্যাদির দ্বারা চিহ্নিত করা হল। এই পদ্ধতিটি আমেরিকার মাটি জরিপ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত এবং মাটির গ্রথন প্রকাশের কাজে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পরীক্ষা লব্ধ কাদা, পলি এবং বালির শতাংশ ঐ গ্রাফে বসালে একটি বিন্দুতে মিলিত হবে। ঐ বিন্দুটি গ্রাফের যে অংশে পড়বে তা থেকে গ্রথনের সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে। শুকোনো এবং ওজন করার কাজ সময় সাপেক্ষ। বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে সিলিণ্ডারের মধ্যে একটি স্পেশ্যাল হাইড্রোমিটার বসিয়ে ভাসমান পদার্থের পরিমাণ জানা যায়। হাইড্রো-মিটার পদ্ধতিটির দ্বারা অতি অল্প সময়ে গ্রথন সম্পর্কিত তথ্য জানা যায় বটে, কিন্তু উপরের পদ্ধতিটির তুলনায় পুরোপুরি নির্ভুল না হলেও সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য।

গঠন

জৈব পদার্থের সহযোগে প্রধানত কাদা, পলি এবং বালি কণার মধ্যে দানা বাঁধার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রথন নির্ণয় করতে দানাগুলো ভাঙতে হয়েছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে। তা না করে যদি অল্প চাপ কিংবা কেবল জলের সংস্পর্শে এনে দানাগুলির বাঁধন ক্ষমতা মাপা যায় তা হলে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যায়। জৈব পদার্থ ব্যতীত পৃষ্ঠতলে অবস্থিত জল হাইড্রোজেন বন্ধনী সহযোগে দানা বাঁধার কাজ করে।

দু রকম পদ্ধতিতে বাঁধন ক্ষমতা মাপা যেতে পারে। এই কাজের জন্য মাঠ থেকে একটি নাতি বৃহৎ মাটির ডেলা সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত শীতকালে নমুনা সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। এই সময়ে মাটি অসম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে এবং গঠন নির্ণয়ের পক্ষে উপযোগী। মাটির ডেলাটিকে এক মিটার উঁচু থেকে একটি কঠিন শিলাখণ্ডের উপর পড়তে দেওয়া হল। ফলে, দানা বাঁধার ক্ষমতানুসারে ডেলাটি কয়েকটি আয়তনের ও আকারের ছোট ছোট ডেলায় ভেঙে যাবে। জৈব পদার্থের সহযোগে কাদামাটির বাঁধন ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি। সুতরাং ভেঙে যাওয়া ছোট ছোট ডেলাগুলোর সংখ্যা হবে কম, কিন্তু তাদের আয়তন হবে বড়ো। বালির সাধারণত কোন গঠনই নেই। পলি বা বালি মাটির সঙ্গে কাদামাটি উপযুক্ত পরিমাণে যুক্ত থাকলে গঠন সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যে-সব মাটির গ্রথন কাদামাটির দিকে ঘেঁষা তাদেরই পক্ষে গঠন তৈরি হওয়া সম্ভব।

এই বিষয়টি অন্যভাবেও পরীক্ষা করা যায়। বিভিন্ন ছিদ্রযুক্ত দু'টা এক সারি ছাঁকনি একটি ফ্রেমে এমনভাবে রাখা হল যাতে সবচেয়ে বড়ো ছিদ্রযুক্ত (২ মিমি) ছাঁকনিটি সর্বোপরি থাকে এবং সর্বনিম্ন ছাঁকনিটির ছিদ্র সবচেয়ে কম। তারপর ঢাকনাখোলা অবস্থায় উপরের ছাঁকনিটিতে মাঠ থেকে আনা মাটির একটি ডেলা রাখা হল এবং ফ্রেমবাঁধা ছাঁকনিগুলি একটি জলভরা পাত্রে এমনভাবে ডুবিয়ে দেওয়া হল যাতে সবচেয়ে উপরের ছাঁকনিটি জলে ঢাকা পড়ে। তারপর ঐ ফ্রেমটিকে কুড়ি থেকে পঁচিশ বার উপরে নিচে করা হল। উদ্দেশ্য এই যে জলের সংস্পর্শে এসে মাটির ডেলাটি বড়ো ছোট দানায় ভেঙে যাবে। ক্রমশ ছোট দানাগুলো নিচের ছাঁকনিতে জমা হবে এবং অপেক্ষাকৃত বড়ো গুলো থাকবে উপরের ছাঁকনিগুলিতে। এবার ফ্রেমটি তুলে নিয়ে প্রত্যেকটি ছাঁকনিতে কত পরিমাণ মাটির ছোট বড়ো ডেলা জমা হয়েছে তা মাপা হল। অবশ্য তার আগে ডেলা-গুলিকে শুকিয়ে নিতে হবে। দানাবাঁধার দৃঢ়তা অনুসারে ছাঁকনিগুলিতে অবস্থিত ডেলাগুলির আয়তন, আকার ও ওজন বিভিন্ন হবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে গঠন সম্পর্কে একটি মাত্রাগত ধারণা করা যায়। হিসাবটি এই রকম। প্রত্যেকটি ছাঁকনির ছিদ্রের ব্যাস এবং তাতে যে পরিমাণ মাটি ধরা পড়েছে এই দুটি সংখ্যা নিয়ে একটি গ্রাফ টানা হল। তা থেকে জানা যায় 0·25 মিমি ব্যাসের ছিদ্রযুক্ত ছাঁকনিতে (কাল্পনিক) কী পরিমাণ মাটি ধরা পড়তে পারে। গোড়ায় যে ডেলাটি নেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে এই পরিমাণের অনুপাত কণাসমষ্টির বাঁধনির দৃঢ়তা নির্ণয় করে। যে মাটিতে এই অনুপাত যত বড়ো, গড় গঠনও তত দৃঢ়।

এছাড়া মাটির ডেলার কোন একটি উপযুক্ত জায়গা থেকে পাতলা সেক্‌সন কেটে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বিভিন্ন ব্যাসযুক্ত কণাগুলির আনুপাতিক হিসাব পাওয়া যায়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে গঠন সম্পর্কে একটি আপেক্ষিক মাপকাঠি স্থির করা যায়।

মাটির আকার

মাটি তৈরির সময় তার গাঠনিক উপদানগুলির আকার ও আয়তন যে অবস্থায় থাকে কৃষিকার্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই সব আকার ও আয়তন কমবেশি পরিবর্তিত হয়। প্রধানত চার শ্রেণীর মাটির আকার চিহ্নিত করা হয় :

(ক) অনেকগুলি পাতলা পাতের স্তর বিন্যস্ত হয়ে প্লেট আকার তৈরি হয়। অকর্ষিত জমিতে অথবা জলবাহিত মাটি জমে গিয়ে প্লেট আকার ধারণ করে। সাধারণত মাটির উপরের স্তরে এই ধরনের আকার দেখা যায়।

(খ) উপরের তলার জৈবপদার্থযুক্ত মিহি কাদা মাটি নিচের দিকে বাহিত হয়ে ক্রমশ জমে জমে স্তম্ভ আকার ধারণ করে। এদের ধারগুলো স্পষ্ট এবং উচ্চতা 15 সেমি কিংবা তারও বেশি হতে পারে। এদের আকারকে বলা হয় প্রিজ্‌ম্‌সম।

(গ) প্রিজ্‌ম্‌সম স্তম্ভের ধারগুলি ধুয়ে ধুয়ে ভোঁতা হয়ে গেলে বলা হয় প্রকৃত স্তম্ভ। সাধারণত সোডিয়াম লবণ-যোগে মাটিতে এই ধরনের আকার নজরে পড়ে।

(ঘ) যে মাটির ডেলা বেশ বড়ো আয়তনের কিন্তু কোন জ্যামিতিক আকার ধারণ করে না তাদের বলা হয় চাঙর বা তাল। কখনো দেখা যায় চাঙর আকারের বড়ো ডেলা সামান্য চাপে অথবা উঁচু থেকে কঠিন শিলার উপর ফেললে ভেঙে যাওয়া ছোট ডেলাগুলির ধারগুলি অনেক সময় কৌণিক ধরনের হয়। তাদের বলা হয় কৌণিক চাঙর। কখনো কখনো প্রায় গোলাকার কিংবা ক্ষুদ্রতর চূর্ণাকার ডেলায় (1 সেমি ব্যাসার্ধ) ভেঙে যায়। গঠনের এইসব তথ্য থেকে মাটিতে অতীতে কী ধরনের বিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল বিক্রিয়া এত শ্লথগতি যে 50-100 বছর সময় লাগে বিভিন্ন গঠন তৈরিতে। মাটি তৈরির পর নানাবিধ ভৌতিক এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে জল, জীবাণু ও জৈব পদার্থের সহযোগে মাটির গঠন স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। গঠনের দ্বারা যেমন কৃষিকর্ম প্রভাবিত হয়, তেমনি কৃষিকর্মে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি, অবিরাম চাষ এবং অপরিমিত রাসায়নিক সার গঠনকে বিনষ্ট করে। জল ও বায়ু চলাচলের সুবিধা অসুবিধা, গাছের শিকড়ের গতিবিধি ইত্যাদি নির্ভর করে মাটির গঠনের উপর। ছোট ছোট মাটির দানা পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলে জলবায়ু চলাচল সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হতে পারে এবং গাছের শিকড়ও অবাধ গতিতে পুষ্টি আহরণের জন্য অগ্রসর হতে পারে। চাঙর তাল বা স্তম্ভাকার মাটির ক্ষেত্রে জলবায়ু চলাচল ব্যাহত হয়। গাছের শিকড়ও পুষ্টি আহরণের জন্য মাটির গভীরে যেতে পারে না। ফলে, গাছ ক্রমশ শীর্ণ হয়ে পড়ে।

মাটির ঘনত্ব

105° সে তাপকামরায় শুকোনো মাটিকণার নিরেট ঘনত্ব 2·6-2·75 গ্রাম / ঘন মিলি। কোন কঠিন পদার্থের নিরেট ঘনত্ব মাপবার জন্য জানা দরকার তার ওজন (গ্রাম) এবং ঘন আয়তন (মিলি)। ওজন মাপা সহজ। ঘন আয়তন মাপতে চাই সরু মুখওয়ালা একটি 100-150 মিলি ঘন আয়তনের বোতল। জানা ওজনের কঠিন পদার্থটি বোতলে ঢেলে জল দিয়ে ভরতি করা হল। যে মাপের বোতল তা থেকে কতখানি কম জল দরকার হল বোতলটি সম্পূর্ণ ভরতে, তা থেকেই কঠিন পদার্থটির ঘন আয়তন পাওয়া যায়। মাটির বেলায় জল ব্যবহার করার অসুবিধা এই যে জলের সংস্পর্শে মাটি ফেঁপে ওঠে, অতএব মাটির প্রকৃত ঘন আয়তন মাপা যায় না। অতএব জলের বদলে এমন একটি তরল পদার্থ নির্বাচন করতে হবে যার সংস্পর্শে মাটি ফেঁপে উঠবে না। এরকম একটি সাধারণ তরল বস্তু হল কেরোসিন। অতএব জলের পরিবর্তে কেরোসিন ব্যবহার করে মাটির ঘন আয়তন পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার যে প্রাপ্ত ঘন আয়তন কেরোসিনের ঘন আয়তনের মাপে। জলের মাপে পেতে হলে (জলের ঘনত্ব 1·0) প্রাপ্ত ঘন আয়তনকে কেরোসিনের ঘনত্বের (জলের তুলনায় কম) দ্বারা গুণ করতে হবে।

মাটিতে অবস্থিত জলবায়ুর অনুপাত

বলা বাহুল্য জলবায়ু এবং জৈব পদার্থ সমন্বিত মাটির আপাত ঘনত্ব মাটির নিরেট ঘনত্ব থেকে কম হবে। প্রকৃত পক্ষে গ্রথনের বিভিন্নতা এবং জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে মাটির আপাত ঘনত্ব হল 1.00-2.00 গ্রাম ঘন মিলি। কাদার প্রাধান্য অথবা জৈব পদার্থের আধিক্য থাকলে মাটির আপাত ঘনত্ব কম হবে। বেলে বা দো-আঁশ মাটির আপাত ঘনত্ব বেশি হবে। কিন্তু গভীর তল-দেশে কাদামটি ঠাস বুনট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন তার

আপাত ঘনত্ব হবে বেশি। অতএব মাটির আপাত ঘনত্ব থেকে গ্রথন, গঠন এবং জৈব পদার্থ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তাছাড়া মাটিতে বায়ুর ঘন আয়তন কতখানি তা মাটির আপাত এবং নিরেট ঘনত্ব থেকে নির্ণয় করা যায়। আপাত ঘনত্ব ও নিরেট ঘনত্বের অনুপাত থেকে 1.0 বাদ দিয়ে, বিয়োগফলকে 100 দ্বারা গুণ করলেই বায়ুর ঘন আয়তনের শতাংশ পাওয়া যাবে।

জলের কথা

কৃষি কর্মসহ মাটিকে বহু কাজে ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়ে মাটির উপযোগিতা বিচার করতে যে বৈশিষ্ট্য সব চেয়ে বেশি জানা দরকার তা হল মাটির সঙ্গে জলের ভৌতিক বিক্রিয়া। আপাত দৃষ্টিতে জল একটি সহজ ও সরল পদার্থ। প্রকৃত পক্ষে জল বেশ জটিল প্রকৃতির। ফর্মুলা অনুসারে মাত্র 18 হল জলের আপেক্ষিকভর। অথচ তরল। তুলনায় সমপর্যায়ের হাইড্রোজেন সালফাইড, 34 হল আণবিক ভর, পারিপার্শ্বিক তাপে ও চাপে গ্যাস। অতএব জলের বাষ্প হওয়াই আশা করা গিয়েছিল। তরল হওয়ার তাৎপর্য এই যে তরল অবস্থায় জলের আণবিক ভর বেশি। এটা কী করে সম্ভব হতে পারে? বস্তুত জলের আণবিক গঠন রৈখিক এবং সমতলীয় অর্থাৎ H—O—H নয়, বরং $\mathrm{H}\diagdown_{\mathrm{O}}\diagup\mathrm{H}$। ফলে দুই H-এর মধ্যে কৌণিক দূরত্ব 180°র বদলে হল 105° এবং H দুটি একই তলে অবস্থিত নয়। এই রূপ আণবিক গঠনের পরিণতি হল এই যে ছয়টি জলের অণু হাইড্রোজেন বন্ধনীর সহযোগে একটি ষষ্ঠ ভুজ এবং ত্রিমাত্রিক বৃহদণু সৃষ্টি করল। এই বৃহদণুটির বৈশিষ্ট্য এই যে এর ধারে পাশে এবং উপরে নিচে অনেকগুলি ষষ্ঠভুজ যোগ হতে পারে। এই ভাবে জলের বৃহদণুর একাধিক স্তর সহযোগে অতিবৃহদণুও তৈরি হতে পারে। পারিপার্শ্বিক তাপশক্তি বৃহদণুগুলির ভাঙা-চোরার কাজ করে। ফলে, তরল অবস্থায় জল একটি গড় ভর লাভ করে। এই ভর অবশ্যই 18-র চেয়ে অনেক বেশি। তাপশক্তি বেশি হলে হাইড্রোজেন বন্ধনী শিথিল হয়ে পড়ে এবং জলের বৃহদণুর ভরও কমতে থাকে। বাষ্প অবস্থায় হাইড্রোজেন বন্ধনী কার্যকরী নয়, অতএব জলের অণু তার একক সত্তা ফিরে পায়।

জলের প্রতি মাটির আকর্ষণ

জল মাটি কণার সঙ্গে দু ভাবে আকৃষ্ট হতে পারে। আকর্ষণ প্রধানত কৈশিক। মাটিতে বিভিন্ন আয়তনের কণার সমাবেশের ফলে বিভিন্ন আয়তনের ফাঁক তৈরি হয়। এই ফাঁকগুলির সমষ্টিগত ফলশ্রুতি কৈশিক আকর্ষণ। কণা যত ক্ষুদ্র হবে ফাঁকও তত ক্ষুদ্র হবে, কিন্তু কৈশিক শক্তি হবে বেশি। অতএব যে মাটিতে কাদা কণার অণুপাত বেশি সেই মাটির কৈশিক শক্তিও বেশি। একই কারণে পলি ও বালি মাটির কৈশিক শক্তি খুবই কম। এর তাৎপর্য এই যে কাদাকণা অধিকমাত্রায় জল ধরে রাখবে এবং তাও খুব জোরে। সেই তুলনায় পলি ও বালি মাটি জল টানবে অল্পমাত্রায়। জল ধরে রাখার ক্ষমতাও হবে কম। এখানে বলা দরকার যে কাদামাটির ফাঁক ক্ষুদ্র আয়তনের হলেও সমষ্টিগত আয়তন হবে বেশি। সেই কারণে জলধারণের ক্ষমতাও হবে বেশি।

মাটির জল টেনে নেওয়ার দ্বিতীয় পদ্ধতি হল কণাগুলির পৃষ্ঠতলীয় আকর্ষণ। এখানেও মাটির কণা যত ক্ষুদ্র হবে তার পৃষ্ঠতলীয় বর্গ আয়তন হবে তত বেশি এবং সেই সঙ্গে জল টানার ক্ষমতাও। বালি ও পলিকণার পৃষ্ঠতলীয় ঘন আয়তন কম হওয়ার দরুন জল টানার ক্ষমতাও কম। কৈশিক এবং পৃষ্ঠতলীয় আকর্ষণের মধ্যে বিভেদ খুব স্পষ্ট নয়। এই দুই প্রকার আকর্ষণের সমন্বয়ে মাটির কণাসমষ্টি জল টানে এবং ধরে রাখে। এর তাৎপর্য এই যে গাছপালা প্রয়োজন মত শিকড়ের সাহায্যে জল ও তার সঙ্গে মাটিতে অবস্থিত পুষ্টি দ্রব্যাদি টেনে নিতে পারে। আগেই বলা হয়েছে মাটিতে জল বেশি থাকলেও সবটুকুই গাছপালার পক্ষে লভ্য না-ও হতে পারে। মাটির জল ধরে রাখার রাখার ক্ষমতা এবং শিকড়ের শোষণ ক্ষমতার বৈষম্যের উপর নির্ভর করবে লভ্যাংশ জলের পরিমাণ।

মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা

মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা এই ভাবে নির্ণয় করা যায়। মাটির নমুনা বিভিন্ন আর্দ্রতায় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর পাম্পের সাহায্যে যতটা সম্ভব বের করে নেওয়া হল। এমনি করে মাটির আর্দ্রতা (শতাংশ) ও পাম্পের ক্ষমতার (বার এককে প্রকাশ্য) সঙ্গে একটি গ্রাফ টানা হল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক যে তিনটি বিভিন্ন গ্রথনের

100 গ্রাম মাটিকে (যথা, বালি, দো-আঁশ এবং কাদা) 20 গ্রাম জলে ভেজান হল। অর্থাৎ সবকটি নমুনার আর্দ্রতা কুড়ি শতাংশ। অথচ বালি, দো-আঁশ এবং কাদামাটি থেকে জল টেনে বার করতে পাম্পের ক্ষমতা লাগল যথাক্রমে 0.02,15 এবং 500 বার। পাম্পের এই ক্ষমতায় আর জল বের করা যাচ্ছিল না। যে শতাংশ জল বের করা গেল তার পরিমাণ মাত্র 90, 70 এবং 10। অর্থাৎ কাদামাটি জল ধরার ক্ষমতা পলি ও বালি মাটির তুলনায় অনেক বেশি। যে মাটিতে জলের চাপ যত বেশি সে তত বেশি জল ছেড়ে দেবে। এই সূত্র অনুসারে বালিমাটিতে জলের চাপ বেশি, দো-আঁশ মাটিতে তুলনায় কম এবং কাদামাটিতে খুবই কম। অন্য কথায় বলা যায় যে মাটিতে অবস্থিত জলের পরিমাণ দিয়ে ঠিক করা যাবে না যে সেই মাটি গাছপালার জন্য প্রয়োজনীয় জল ছাড়বে কিনা। গ্রথন জানা থাকলে জল ছাড়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু বলা যায়। কাদামাটি জল ছাড়ে কম, কিন্তু জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে সেই মাটির গঠন যদি এমন হয় যে অল্প চাপে অনেক ছোট বড়ো দানায় ভেঙে যাচ্ছে, তাহলে সেই মাটির জল ছাড়ার ক্ষমতা বেশি হবে। অতএব কাদামাটিকে জল ছাড়তে বাধ্য করা যায় জৈব পদার্থের যোগে। এই প্রকার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মাটির গ্রথন ও গঠনের সঙ্গে জল ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। এই জন্যই কৃষিকর্মে উপযুক্ত মাটির গ্রথন ও গঠন জানা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে মাটির রং-ও জানা চাই, কারণ এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উপরে যা বলা হল, তা থেকে প্রমাণিত হল যে মাটি নিয়ে সামান্যতম পরীক্ষার দ্বারা, যেমন রং, গ্রথন, গঠন, ঘনত্ব এবং জলের চাপ নির্ণয় করে মাটি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্ব জানা যায়। এই সব পরীক্ষালব্ধ তথ্য মাটির ভৌতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। অধিকতর জটিল রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করে মাটির সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাবে।

মাটি তৈরির পদ্ধতি

মাটির উৎপত্তি শিলা থেকে। শিলা নানা ধরনের। পৃথিবীর জন্মকাল থেকে এই সব শিলা তাপ, শৈত্য বৃষ্টি, অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদির সংস্পর্শে নিয়ত রূপান্তরিত হয়েছে। বহু বছরের রাসায়নিক এবং ভৌত বিক্রিয়াদির প্রভাবে কঠিন শিলাপৃষ্ঠে একটি অপেক্ষাকৃত নরম এবং কণাবিশিষ্ট আস্তরণ তৈরি হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে আস্তরণটি কঠিন শিলা থেকেই উদ্ভূত কিন্তু একটি সামান্য পরীক্ষার দ্বারা দেখানো যায় যে আস্তরণটির কণা সমষ্টি এবং চূর্ণীকৃত শিলার মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। দুটি কাঁসার পাত্রের (45 সে মি ব্যাস এবং 1 সে মি উঁচু) তলদেশে কতগুলি ছিদ্র করা হল এবং মাপমত চোষ কাগজের দ্বারা তলদেশ ঢেকে দেওয়া হল। অতঃপর যথাক্রমে <2 মি মি শুকনো নমুনা-মাটি এবং চূর্ণীকৃত ($2<$ মি মি) শিলার দ্বারা পাত্রদুটি কানায় কানায় ভরাট করা হল। দুটি পাত্রই একটি বড়ো পাত্রে এমনভাবে রাখা হল যাতে ছোট ও বড়ো পাত্রের তলদেশ না ঠেকে যায়। অতঃপর বড়ো পাত্রটিতে জল ঢালা হল যাতে ছোট দুটি পাত্রের প্রায় অর্ধেক ডুবে থাকে। বড়ো পাত্রটির উপর একটি ঢাকনা রাখা হল যাতে জলের বাষ্প দ্রুত উড়ে না যায়। চব্বিশ ঘণ্টা পরে ছোট পাত্র দুটিকে পরীক্ষা করা হল। দেখা যাবে যে মাটিভরা পাত্রটিতে মাটি ফেঁপে কানা ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পাত্রটির শিলাচূর্ণ প্রায় একই অবস্থায় আছে অথবা সামান্য চুপ্‌সে গেছে। মাটির নমুনা যদি কালো বা বাদামি রং-এর হয়, তাহলে লাল কিংবা হলুদ রংএর মাটির তুলনায় অনেক বেশি ফেঁপে উঠবে। বড়ো পাত্রটিতে জল ঢালার একটু বাদেই নজর করলে দেখা যেত যে মাটি দৃশ্যত জল টেনে নিচ্ছে, অথচ শিলাচূর্ণ একটুও জল টানছে না। শিলাচূর্ণ চুপসে যাওয়ার কারণ এই যে জলের উপস্থিতিতে আবদ্ধ বায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে। মাটির ক্ষেত্রেও বায়ু বেরোয় বটে কিন্তু ফেঁপে যাওয়ার ফলে ঘন আয়তনের বৃদ্ধি অনেক বেশি হওয়ার দরুন চুপসে যাওয়া চোখে পড়ে না। এবার ছোট পাত্র দুটি থেকে কিছুটা মাটি ও শিলাচূর্ণ সরিয়ে নিয়ে অতি ধীরে একটুখানি জল ঢেলে দেওয়া হল। দেখা যাবে যে শিলাচূর্ণ ভরা পাত্রটির তলদেশ থেকে জল অতি দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে অথচ মাটি ভরা পাত্রটি থেকে জল একেবারেই বেরোচ্ছে না অথবা অতি ধীর গতিতে বেরোচ্ছে। এই সামান্য পরীক্ষার দ্বারা শিলাচূর্ণ এবং শিলা থেকে উদ্ভূত মাটির বিভিন্নতা অতি সহজে বোধগম্য হচ্ছে।

উল্লিখিত ভৌত পরীক্ষার দ্বারা মাটি ও শিলাচূর্ণের বিভেদ স্পষ্ট রূপে দেখানো হয়েছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা এই বিভেদ আরো স্পষ্ট করে দেখানো যায়। শিলার এবং তার থেকে উদ্ভূত মাটির রাসায়নিক উপাদান প্রায়

একই রকমের, কিন্তু তাদের পরিমাণের তারতম্য লক্ষ করা যায়। বেশির ভাগ মাটিতেই সিলিকার পরিমাণ অধিকতর কিন্তু আয়রণ এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম এবং সোডিয়ামের পরিমাণ অধিকাংশ শিলার ক্ষেত্রে অনেক বেশি। এই রকম তুলনামূলক তথ্যের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষিত হলেও মাটিতে অবস্থিত জল ও জৈব পদার্থের পরিমাণ সব ক্ষেত্রেই অনেক বেশি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাটির অথবা শিলায় অবস্থিত প্রায় এক ডজন রাসায়নিক উপাদানের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা অত্যন্ত ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া উচ্চমানের গবেষণাগার ব্যতীত এই বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কিন্তু মাটি তৈরির সঠিক পদ্ধতিগুলি জানতে হলে বিকল্প কোন উপায় নেই। অনুরূপ বিশ্লেষণ এবং যে সব জায়গায় শিলা থেকে মাটি তৈরি হয়েছে তারই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মাটির উৎপত্তি সম্পর্কে যে ধারণার উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রধানত দিনে গরম রাতে ঠাণ্ডার জন্য তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে শিলাখণ্ড ভেঙে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হয়। শিলাস্তরের ফাটলে জল ঢুকে পরিণত হলে ঘন আয়তনের বৃদ্ধি ঘটে। তার চাপেও শিলাখণ্ড ভেঙে যায়। এ ছাড়া কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও শিলা খণ্ড ধীরে অথচ অবিরাম গতিতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়। এদের মধ্যে সোদন, জারণ-বিজারণ এবং কার্বনেটকরণ এই তিনটি বিক্রিয়ার ফলে শিলাস্থিত উপাদানগুলির ঘন আয়তন বৃদ্ধি-লাভ করে এবং ধীরে ধীরে পাতলা পাতলা টুকরো শিলাখণ্ড থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে আসে। ফেরাস অক্সাইড জারিত হয়ে জলের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে ফেরিক হাইড্রক্সাইড প্রস্তুত করে। তেমনি ফেরাস সালফাইড জারিত হয়ে তৈরি করে ফেরাস সালফেট। অন্য দিকে জলাবৃত অবস্থায় ফেরিক অক্সাইড রূপান্তরিত হয় ফেরাস অক্সাইডে। আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়ার দ্বারা শিলাস্থিত মিনারেল ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সোদন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং উদ্ভূত ক্ষারীয় বস্তু কার্বন ডাই-অক্সাইডের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কার্বনেট তৈরি করে। উন্নিখিত বিক্রিয়ার আর একটি সাধারণ ফল হল ঘন আয়তন বৃদ্ধি। আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে সিলিকেটের ক্ষারীয় এবং আম্লিক উপাদান পৃথক হয়ে যায় এবং দ্রবণীয় অংশ বারিপাতের প্রভাবে স্থানান্তরিত হয়। পড়ে থাকে স্বল্পদ্রব আম্লিক সিলিকেট। আর্দ্রবিশ্লেষণের তীব্রতা নির্ভর করে বারিপাত এবং তাপ-মাত্রার উপর।

শিলাপৃষ্ঠ কঠিন হলেও কোন কোন গাছ বা উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে পুষ্টি আহরণ করতে পারে। গাছের পাতা ইত্যাদি অংশ জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং নানাবিধ আম্লিক জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। আম্লিক পরিবেশে শিলাখণ্ড দ্রুতগতিতে ভাঙতে এবং রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করে। যদি শিলা-পৃষ্ঠ মোটামুটি সমতল হয় তা হলে মাটি তৈরির কাজ ক্রমশ পৃষ্ঠদেশ থেকে শুরু করে নিচে অগ্রসর হতে থাকে এবং তৈরি মাটির স্তর ক্রমশ গভীরতা লাভ করে। পৃষ্ঠস্তর থেকে অবিকৃত শিলাস্তর কত গভীরে তা অনায়াসে মাপা যায়। ঢালু অবস্থায় শিলাপৃষ্ঠে তৈরি মাটি বৃষ্টির জলে স্থানান্তরিত হয়ে পলিমাটিতে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, ঢালু এবং সমতল শিলাপৃষ্ঠে তৈরি মাটির প্রকৃতি বিভিন্ন হবে। তা ছাড়া শিলার মধ্যেও বিভেদ রয়েছে। তার দরুন মাটির প্রকৃতি বিভিন্ন হতে বাধ্য।

আর কী কী জানতে হবে

মাটিতে যে সব প্রধান প্রধান মিনারেল পাওয়া যায় তার সঙ্গে শিলাস্থিত মিনারেলের বিশেষ কোন মিল নেই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ শিলাচূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় মাটির সঙ্গে মিশে থাকতে পারে। শিলা এবং মাটি-স্থিত মিনারেলগুলি বেশির ভাগই কেলাসিত বটে, কিন্তু পার্থক্য এই যে শিলাস্থিত মিনারেলগুলি ত্রিমাত্রিক, মাটিস্থিত মিনারেলগুলি দ্বিমাত্রিক। অন্তভাবে বলা যায় যে শিলাস্থিত মিনারেলগুলি প্রাথমিক পর্যায়ের এবং রূপান্তরিত মাটিস্থিত মিনারেলগুলি মাধ্যমিক পর্যায়ের। এই রূপান্তর কী প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তা বারান্তরে যথাস্থানে আলোচিত হবে। বস্তুত এই রূপান্তরের জন্যই মাটি তার বৈশিষ্ট্য পেয়েছে—যেমন জল ও পুষ্টি ইত্যাদি ধরে রাখা এবং প্রয়োজন মত গাছপালার কাছে পৌছে দেওয়া। কী ভাবে এই জটিল পদ্ধতি কাজ করে তা জানা অত্যাবশ্যক।

মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ সামান্য হলেও তার গুরুত্ব কম নয়। উদ্ভিদ জীবাণু ইত্যাদি থেকে তৈরি হয়েছে মাটির জৈব পদার্থ বা হিউমাস। এখানেও নানাপ্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে হিউমাস তৈরি হয়। হিউমাস কয়েকটি জটিল বৃহদণু যৌগের সমষ্টি। তাদের সঙ্গে পরিচিত না হলে

মাটিতে হিউমাসের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে না।

মাটি অসংখ্য জীবাণু, যথা ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি এবং কেঁচো, ওবরে পোকা ইত্যাদি কীটের আশ্রয়স্থল। মাটিতে তারা নানাপ্রকার জৈব যৌগকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে, কিন্তু প্রতিদানে যা দেয় তার মূল্য অপরিসীম। জীবাণুদের না জানলে মাটির প্রকৃত পরিচয় সম্ভব নয়। এই বিষয়টিও বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে।

কৃষিব্যতীত মাটির অন্য যেসব ব্যবহার প্রচলিত সে বিষয়ে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। মাটিকে সম্যক বুঝতে হলে এই বিষয়ে আরও কিছু তথ্য জানা দরকার হবে।

মাটিতে প্রচুর পুষ্টিদ্রব্য রয়েছে কিন্তু সবটাই উদ্ভিদরা আহরণ করতে পারে না। মাটির এই ধরে রাখার প্রবৃত্তি বাধ্য করেছে সহজলভ্য পুষ্টিদ্রব্য (যথা রাসায়নিক সার) বাইরে থেকে আমদানি করতে। কী সার, কতখানি দেওয়া হবে এবং কী ভাবে—এই সব তথ্য জানতে হলে মাটির সঙ্গে সার ইত্যাদির বিক্রিয়া জানা চাই।

শস্যোৎপাদন কর্মে কীট পতঙ্গ এবং আগাছা থেকে গাছকে বাঁচাতে রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাতে মাটির কী পরিবর্তন হতে পারে সেই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানা দরকার।

জল ও বায়ুর প্রকোপে ভূমিক্ষয় কী পরিমাণ ক্ষতি করে এবং যে সব পদ্ধতির দ্বারা ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে বিষয়েও তথ্যাদি জানা অত্যন্ত জরুরি।

ক্ষতিকর বর্জ্যবস্তু থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া কিংবা গভীরে পুঁতে ফেলা সর্বদেশে প্রচলিত। তা ছাড়া অমনোযোগী কৃষিকর্মের জন্যও মাটির বৈশিষ্ট্য ব্যাহত হয়। এই সব প্রক্রিয়ার ফলে মাটির কী রূপান্তর ঘটে সে সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতা অমার্জনীয়। মাটিকে সুস্থ রাখতে হলে কী করণীয় তা সম্যক রূপে জানা দরকার।

প্রায় অসংখ্য রকমের মাটি নজরে পড়ে। তা সত্ত্বেও কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করে মাটির শ্রেণী-বিভাগ সম্ভব হয়েছে। মাটির মত জটিল অথচ অমূল্য সম্পদকে ভালোভাবে জানবার ও উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করার জন্য শ্রেণী-বিভাগ কতখানি সাহায্য করতে পারে, জানতে হবে।

আমাদের ঘরে নিতে হচ্ছে যে, ভাগ-ভাগ করে মাটি এবং তার উপাদানগুলি সম্পর্কে জানলেই মাটির সামগ্রিক চিত্রটি ধরা পড়বে। কিন্তু এই ধারণা আংশিক সত্য। সামগ্রিক ভাবে মাটিকে চেনার পদ্ধতি জানা নেই। অতএব ধরে নিতে হচ্ছে যে প্রায়োগিক উপযোগিতা নির্ধারণের পক্ষে ভাগ-ভাগ করে জানাই যথেষ্ট।

(আগামী সংখ্যায়)

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মৃৎবিজ্ঞানী ড. সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। বিজ্ঞান এবং সমাজসেবামূলক অসংখ্য ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সর্বক্ষণ সক্রিয়ভাবে যুক্ত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বর্তমানে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট।

ওজো

সুশীল সিংহ

মাটির দেওয়ালে ছুটি বাঁধানো ফোটো। ঝিমুটির ভাষায় 'ফটোক'। এমন ফটোক ঝিমুটিতে অজয় কাহার ছাড়া নামো পাড়ায় আর কারও ভিটের নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ ঝিমুটি নামো পাড়ার আর কেউ কোনদিন গাঁ ঘর ছেড়ে রুটি খুঁজতে, দুনিয়া দেখতে গাঁয়ের বাইরে যায়নি। নামো পাড়ার অজয় কাহার—ঝিমুটিতে যাকে সবাই ডাকে ওজো—ওজো গিয়েছিল। একবার নয়। বারবার।

পুরনো ছবি ছুটোর পিছনে পুরু ঝুল। ঘষা কাঁচে ময়লার আস্তর।

ওই ছবি ছুটোর মধ্যে অজয়কুমারের যৈবন ধরা আছে। যৈবন। সোনার বয়স। কাঁচা টাকা কামানোর মরশুম।

ওজোর ঠাকুর্দা ভুজঙ্গ কাহার ছিল ডাকাত। সবাই বলত, ভুজো ডাকাত। রণপায়ে সে তিনটে গাঁ রাতারাতি পাড়ি দিত। ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ভুজো। ফাটক হয়েছিল। সাহেবদের জেলে দেহ রেখেছিল সে।

ওজোর বাবা ছিল তুলসী পাতার মত ভালোমানুষ। নাম: কুঁজো কাহার। আসলে কুঞ্জ কাহার। কুঞ্জর সাধ ছিল, তার ছেলে ওজো, বয়সকালে লেখাপড়া শিখে নাম করা কিরযেধ হোক।

ওজো তাই কিছুকাল ঝিমুটির পাঠশালায় পাঠ নিতে গিয়েছিল।

ওজো তার ঠাকুরদার ধাত আর শরীর পেয়েছিল। ঠাকুরদার মত খর্বাকৃতি। কাঁধের ওপর শিলের নোড়ার মত শক্ত আর মজবুত ঘাড়। মাথায় লতিয়ে নামা জলা চুল।

ধান পেটানো তক্তার মত দু'পায়ের পাতা। তালগাছের গুঁড়িকে উল্টে ধরলে যেমন হয়, তেমনি তার উরুর আদল। দু'হাতের পাতা যেন কচ্ছপের পিঠ। আর দু'হাতের দশ আঙুলে, ওজোর ভাষায়, বারিণপুরের ইস্টিল মেশানো আছে।

ওজোর যৈবনের বারিণপুর। অর্থাৎ বার্ণপুর। সেইসব চৌহদ্দি অজয় কাহার কবে পাড়ি দিয়েছে। আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বার্ণপুর, বরাকর, চিনাকুড়ি, চিরকুণ্ডা, এই সব লাইনে, একদা বাস কনডাকটরের কাজ করেছে সে।

ওজো, শুয়ে শুয়ে, ফ্যালফ্যাল করে তার পায়ের দিকে, দেওয়ালে ঝোলানো ফটোক ছুটোর দিকে তাকিয়েছিল।

একটা ছবিতে ওজো মাইথনের কাছে কল্যাণেশ্বরীতে মায়ের পুজো দিচ্ছে।

ছুটো ফোটোর দিকে তাকালে, আসলে কিছুই বোঝা যায় না। ফোটোকে কোন ছবিই আর নেই। কিন্তু ওজো স্পষ্ট দেখতে পায়।

অন্য ছবিটায়, অজয়কুমারের পরনে হাফ প্যান্ট। পায়ে কয়লাখনির বুট। গায়ে ক্যালকাটা গেঞ্জি। মাথায় লোহার টুপি। কোমরের কাছে সেফটি ল্যাম্প।

ওজো তখন সাঁকতোড়িয়ায় মণ্ডলদের কোলিয়ারিতে লেবার।

হপ্তার দিন কয়লাখনির কলোনিতে, ভাটিখানায় চুর হয়ে যায়। সে কী আমোদ। সে আমোদে গান গাইত—

"ভিণ্ডি এলো বাজারে
আমায় বলে 'বাজা রে'
এই সানকি কোথায় থোব।
আমি সতী নোখ্‌খী
ও ভাই তা জানো কি
রেতে বৌয়ের সঙ্গে শোব।"

ওজো গানের গলা পেয়েছিল ঠাকুর্দা ভুজো ডাকাতের কাছ থেকে। গানের সঙ্গে নাচ। নাচতে নাচতে সুর করে মুখে তোলা ঢাকের বোল। বোলের মাঝখানে জিভের আগায় দু' আঙুল রেখে তীব্র সিটি। সে মুখে মুখে গান বাঁধত। আর একটা গানের মুখপাত ছিল এইরকম—

"অম্বুবাচীর আম কাঁঠালে
নীল মাছিটা কে পাঠালে—।"

যৈবন। অজয়কুমারের যৈবন।

কল্যাণেশ্বরীতে, মায়ের থানে ফটোকে ওজোর বয়স

১৯। তার মানে প্রথম বাড়ি থেকে পালানোর তিন বছর পর। তারও চার বছর পর, ওজোর বাপ, কুঞ্জ কাহার শরীর ত্যাগ করলে, অজয়কুমার বাড়ি এসেছিল। ওজো তখন ২৩। বিয়ে করল। ঝিমুটিতে, নামো পাড়ায়, বাপ ঠাকুর্দার ভিটেয় থাকল টানা ৫ বছর। চাষ আর মাঠের কাজ করছিল। তার বড় ছেলে যখন বড় হয়ে হাঁটতে শিখল, তখন আবার উধাও। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে। টাকা আনে। টাকা বাজায়। ১৫, ২০ দিন থাকে। চলে যায়। তার কাজ আছে। কোলিয়ারিতে চাকরি।

প্রথম সন্তান ছাড়া একটিও বাঁচল না। পরপর চারটি গর্ভ নষ্ট হয় ওজোর স্ত্রীর। ততদিনে অজয়কুমার ৩৪ পার হয়েছে। স্বাস্থ্য আর শরীরে পোকা লেগেছে তার। হেকিম মারল সে পোকা। টাকা খুইয়ে আর চাকরি ছেড়ে, সেই থেকে সে গ্রামে এসে থিতু হয়েছে। আর বাইরে যায়নি।

এখন ওজোর বয়স ৪৮। বিয়ের তিন বছর পর তার প্রথম ছেলে হয়েছিল। সেই শিবরাত্রির সলতের বয়স কত হল, ওজো স্যাঁক কষে বার করতে পারে না। ছেলে গাঁয়ে থাকে না। বাইরে বাইরে। বাপমার সঙ্গে তেনার বহুকাল দেখা নেই। আসেন। চলে যান। ওকে দেখা বলে না।

অজয়কুমার শুয়েই ছিল। মন বাজার। পেটের মধ্যের ব্যথাটা টিস্‌টিস্, ঠিস্‌ঠিস্ করছেই। বদ্‌দোমানের বড় ডাক্তার বলে দিয়েছে, মদ না ছাড়লে ওজো মরবে। হেঃ। ডাক্তারের যেমন কথা। তার পেট নাকি ফেটে জয়ঢাক হয়ে যেতে পারে। হেঃ।

দুর্গাপুজোর ভাসানের ঢাকিরা, বোলের সঙ্গে যে গান গায়, সেই গান মনে পড়ছিল তার—

—দাদ্‌দা গো, দিদ্‌দি গো, সোন্‌নার পিত্‌তিমেখানি
কোত্‌থায় রেখ্‌থে এ-এ্‌লি—গো—
দাদ্‌দা গো, দিদ্‌দি গো—

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, ওজো। ওজো বাড়ি আছ নাকি?

গলা চিনল অজয়কুমার। হিরুবাবু। হিরণ্য বোস। কোলকাতায় থাকে। চাকরি করে। পৌষ মাসে পোয়াতি মাঠ দেখতে আর খেজুরের রস খেতে বাড়ি এয়েচেন শ্লা। তাই অজয়কুমারের খোঁজ।

অজয়কুমার বাইরে এসে দাঁড়াল। আসতেই হবে। হিরু, হিরুবাবু, হিরণ্য বোস তার পোভু। সে হিরণ্যর কিরষেণ। ছেলেবেলায় এক সঙ্গে গাঁয়ের পাঠশালায় ক'বছর পড়েছিল।

—ঘুমোচ্ছিলে নাকি?

ওজোর চোখ লাল। কোলে পিঁচুটি। ঝিমুটের পক্ষে, পৌষ মাস হলেও, এখন বেলা অনেক। সকাল প্রায় সাড়ে আটটা। কলকাতা থেকে ফার্স্ট লোকালে এসেছে হিরণ্য।

—কাল আমার রাত পালি ছিল।

রাত পালি। অর্থাৎ কয়েকজন মিলে রাত জেগে ধান ক্ষেত পাহারা দেবার কাজ।

—এবার ধানের আশা কেমন?

—ধুম চাষ হয়েছে। খুব ফলবে। যাও-না, নিজে দেখে এস—

—সে তো যাবই।···এ্যাহ্‌হা। এই সকালেও পচুই গিলেছ নাকি!

—কোতায় পাব?

—মরে যাবে হে!

—ত যাব। আমার কিছু নেই। তাই মরার ভয়ও নেই। মাইরি—

—ওটি ছাড়।

—ও শালা চিতেয় উঠলে যাবে। শালাই জ্বলবে, কী দাউ দাউ! ক্রেসিন লাগবে না। হিঃ হিঃ। দেখে নিও, হলদে ছাপ ছাপ দাঁত বার করে অজয়কুমার হাসছে।

তবু মরে না অজয়কুমার। মরলে হিরণ্য তার জমি অন্যকে চাষ করতে দিত। আজকাল চাইলেই একজনের কাছ থেকে জমি নিয়ে অন্যকে চাষ করতে দেওয়া যায় না। অথচ ওজোর হাতে জমি ও ধান নিরাপদ নয়। না, নয়। কারণ ওজো কোন পার্টি করে না। সে কোন দলে নেই। আরে আজকালকার দিনে গ্রামে থাকবি, চাষ করবি, আর কোন পার্টিতেই থাকবি না, তাই আবার হয় নাকি? কোন্ পার্টি করবি, তা বলছি না। যেটা তোর মন চায়, কর। মন যদি না চায়, ত লোক দেখানি পার্টি কর। কিন্তু কর। যখনকার যা। না হলে চলে?

১৯৮৫ আর ১৯৮৬ পরপর দু'বছর কুলতলির মাঠে, হিরু বোসের ধান লুঠ হয়েছিল। কুলতলির জমি হল, ঝিমুটির ডাকসাইটে সেরা জমি। একটাই দাগ নম্বরে চার আলের মধ্যে ১১ বিঘে ৭ ছটাক। হিরুবাবুর পৈতৃক। এক অর্থে ওজোরও পৈতৃক। অজয়কুমারের বাবা, কুঞ্জ

কাহার এই জমির বাঁধা কিরষেণ ছিল। এখন যেমন ওজো হিরণ্য বোসের কিরষেণ।

অনেক চোখ, অনেক থাবা কুলতলির দিকে।

হিরণ্য নিশ্চিত যে ওজো যদি যে কোন একটা পার্টিতে থাকত, তাহলে তার জমির ধান পরপর দু'বছর লুঠ হত না। যারা কোন না কোন দলে ছিল তখন তাদের লুঠ হয়নি। জমিতে ঝাণ্ডা পোঁতা ছিল। সে যে ঝাণ্ডা হোক।

'৮৬-র পর অবশ্য আর কোন লুঠ হয়নি। কিন্তু এখন বাতাসে আবার অন্য গন্ধ। '৮৬-র পর থেকে প্রতিবছর ধান বিক্রির পর, ঝিমুটির দু'পার্টির কাওেই চাঁদা দেয় হিরণ্য। কিন্তু আর বোধহয় তাতে চলবে না। সকালে গ্রামে পা দিতে না দিতেই যাদবদের ছেলেরা আবদার করে গেছে, তাদের পাড়ায় সাফল্লতা প্রসার করার জন্যে তারা নাইটস্কুল খুলেছে। সে বাবদ কিছু চাই। তারপর আবার জব্বর ভাই এসে বলল, তারা পুকুর লিজ নিয়ে মাছ-চাষের কো-অপারেটিভ করেছে। এটা গ্রামের বেকার যুবকদের স্বাবলম্বী হওয়ার প্রকল্প।

এসব নতুন শক্তি। নতুন জোট। সবে দাঁত উঠছে। কিন্তু উঠছে। কটা দেবতাকে পেন্নামী দেবে বাবা? গ্রামের আবহাওয়া খুবই ঘোলা।

এবার ধান কাটার মরশুমে নাইট স্কুল আর মাছের সমবায় চাষ, এই দুই দল ধান লুট করার জন্যে নামবে কিনা কে জানে। দুদল ছিল। চার দল হবে। বাবা ওজো, তুই কি একটা দলেও ঢুকতে পারিস না?

—গ্রামের আবহাওয়া কী রকম বুঝচো?

—কে জানে!

—সে কি! আবার কি অশান্তি, লুটপাট এসব হবে নাকি?

—ভগমান জানে।

—আর তুমি?

—আমি কি ভগমান!

—এই জন্যেই পর পর দু'বছর আমার ধান লুঠ হয়ে ভোগে গিয়েছিল

—আমি লুঠ করেছি? আমি ভুজো ডাকাতের নাতি, ডাকাতিই শিখিনি। শিখলে শালা ডাকাতিই করতাম।

—একা সব দিক সামলাতে পারছ না, ত তোমার ছেলেকে ডেকে আনো—

—সে হারামি আসে না।

—কেন? আসে না কেন?

—সে বুদবুদের বাবুর শুঁড়ির দোকানে কাজ করচে। পানাগড়ে দোকান। লাইসিন আছে। আর মরতে আসে এখানে! মালিক নাকি তার বাপ।

—চাষের কাজ জানে না, নাকি?

—খুব জানে।

—তাহলে?

—বারফটকা। কাঁচা টাকা পাচ্ছে। আমার অকৃত। বুঝবে মজা।

—তা ভালো কামাচ্ছে, ভালই ত। ও হয়ত অনেক উন্নতি করবে। থাকুক, ও বাইরেই থাকুক।

এটি হিরণ্যর অজয়কুমারকে গায়ে পড়ে দেওয়া পরামর্শ। ওজোর যদি স্বাস্থ্য ভেঙে যায়—এত মদ খায় যখন ভাঙতেই পারে। ওর পেটের ব্যথা আর বমির ব্যামো ত হল টানা ৫ বছর। কেবলই পাকিয়ে যাচ্ছে—। আর চাষ করতে না পারে, কিংবা ওজো যদি মরেই যায়, তাহলে অন্তত ওজোর ছেলে সামনে এসে দাঁড়াবে না। সে চাষ-বাসের লাইনেই নেই। প্রতিবার গ্রামে এলেই অজয়-কুমারের স্বাস্থ্য আর তার ছেলের সংবাদ জেনে নিতে, হিরণ্য ভোলে না।

—তা ছেলে তোমার শহরে কামাচ্ছে, তা তোমাকে দেয় থোয় কিছু?

—যে দু'বছর তোমার জমির ধান লুঠ হল, সে দুবছর ত আমার কপালেও লবডঙ্কা। পেট বাজিয়ে খাব নাকি? ব্যাটা খাইয়েছিল—

—ঘরে এলেই তাহলে সে তোমাকে টাকা দেয়!

—লবডঙ্কা দেয়।

—ওই যে বললে, দিয়েছিল।

—সে ত দু বছর, তোমার ধান লুঠ হল বলে। তাও টাকা আমায় দেয় নি। আমি নেশা করি যে। দিয়েছে তার মাকে।

—খুব সেয়ানা ত। তা এখনও তার মাকে দেয় নাকি?

—কচু। কচু। আর কি ধান লুঠ হয়েছে যে পেট ভাতা দেবে?

মোদ্দা কথা, ওজোর ছেলে বাইরে রোজকার করছে। সে ঝিমুটিতে চাষ-বাসের লাইনে নেই। নিশ্চিন্তি।

আজ-কালকার যা হাওয়া, তাতে রিটায়ার করলে, পুলিসের গুলি খেয়ে খামোখা মরে গেলে, পরিবারের একজন চাকরি পায়।

সেই হাওয়া তা গ্রামেও। কলকাতার যা কিছু সবই গ্রামে গিয়েছে। সেই হিসেবে, পিতা যদি রিটায়ার করে, অক্ষম হয়, অর্থাৎ বাপের জায়গায় তার ছেলে—

হিরণ্য তার জমিতে কৃষিকাজের ভার এমন একজন কৃষককে দিতে চায় যে গ্রামের রাজনীতিতে না থাকে, যে কোন একটা দলে আছে। সে যে কোন মিছিলের সঙ্গে অন্তত একবার "আমাদের দাবি" করতে করতে কলকাতা ঘুরে এসেছে।

কলকাতার মতই, গ্রামেও, নেতা, সহনেতা, উপনেতা, হবুনেতা, এবং তাদের ছায়ায় ছায়ায় যারা থাকে, আছে, তাদের কারও কোন কিছুতেই হাত পড়ে না। ভাগ, বখরা, নিরাপত্তা এসবেরই একটা বিলি ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার নাম শান্তি।

ঝিমুটিতেও এঁরা আছেন। যেমন পশো, মানে পশুপতি মাস্টার। ছিরে, অর্থাৎ সৃষ্টিধর খাঁড়া। কিমবা সেনো, মানে শান্তি আইচ। এবং ফিরুমোল্লা। গ্রামে এরা দলপতি। মিছিল নিয়ে কলকাতা যায়। বদ্‌দোমান অবরোধ করে। রেল লাইনে অবস্থান, বি. ডি. ও. ঘেরাও, এসব তো বাঁ হাতের খেলা এদের কাছে। চারজনেরই জমি বেড়েছে। এদের কাউকে মুরুব্বি না ধরলে, এক চিলতে জমি কেউ বেচতেই পারবে না। উচিত দাম পাওয়া ত স্বপ্ন। এবং এদের কারো জমিতেই বর্গা হয়নি।

ঝিমুটিতে বর্গা ওসেছে বেশ ক বছর আগে। এ নতুন আইন। চাষ করার অধিকার থেকে ভাগ চাষীকে উচ্ছেদ করা চলবে না। যে শুধু মাত্র কৃষক, যে অন্যের জমিতে চাষ ও ক্ষেত মজুরের কাজ করে, যার কোন লগ্নী নেই, সে শুধু কৃষক।

বর্গা হল ভাগ চাষীদের জন্যে। সে জমিতে শ্রম ত দেয়ই, কিছু কিছু টাকাও ঢালে। তার নিজের হাল, বলদ, লাঙল আছে। লাঙল যার, জমি তার। সিটলমিন্টের খাতায়, গরমিন্টের রিকর্ডে জমির দাগ, আর খতেন নং-এর পাশাপাশি। পরচায় এখন থেকে জমির মালিকের পাশা-পাশি রেকর্ড হবে বর্গাদারের নামও। জমির মালিক যদি জমি বেচতে চায়, তাহলেও ভাগচাষীর কেনার হক আগে। সে যদি না কিনতে পারে, যে খুশি কিনুক। কিন্তু যিনিই কিনুন, সেই জমিতে ভাগচাষীর চাষের অধিকার থাকছেই। মালিক বদলালেও চাষী বদলাবে না। বোঝ। এ কি কম কথা?

এই বর্গা ব্যাপারটা অজয়কুমার বোঝেনি। বুঝতে চায়নি সে। বিশ্বাসও করে নি। বলে কিনা, লাঙল যার, জমি তার। আরে তাই যদি হবে, তাহলে ত—

—জাল যার, পকোর তার। হিঃ হিঃ।

—স্টেরিং আর ঘন্টি যাদের, বাস তাদের। হেঃ হেঃ।

—গাঁইতি যাদের, কয়লা খাদান তাদের। হাঃ হাঃ।

—কলম যাদের, আপিস তাদের। হোঃ। হোঃ।

বর্গা? ও গপ্‌প। ও ভাঁওতা।

পশো, পশুপতি মাস্টার, হিরণ্যকে বলেছিল।

—শোন, হিরু। সত্যি মিথ্যের কথা নয়। সত্যি মিথ্যের ব্যাপারও নয়। আমরা গাঁয়ে থেকে গাঁয়ের কারও বিরুদ্ধে যাব না। তুমি তো আর গাঁয়ে থাক না। তুমি থাক কলকাতায়। এ হলো পাইয়ে দেওয়ার, ভাগ বখরার রাজনীতি। তোমাদের কলকাতায় একরকম, এখানে অন্যরকম। কিন্তু আসলে এক। গ্রামে থেকে, কলকাতার লোকের পক্ষ নিতে পারব না। ওজো মিথ্যে কথা বললেও পারব না। তুমি ছেলেবেলার বন্ধু বলেও পারব না। আমি যদি তোমার দিকে যাই, অন্যদল ওজোর পক্ষ নেবে। অথোন?

পশুপতির পরামর্শ মত হিরণ্য গিয়ে ওজোকে বলল—শোন ওজো, আমার কুলতলির জমি, এক হাতায় ১১ বিঘে ৭ ছটাক, পরচা, দাগ, খতেন নং এত, মৌজা এই, তুমি গত তিন বছর দিন মজুরি আর আমার কাছে পাওয়া পেট ভাতায় চাষ করছ।

—তিন নয়। অনেক বছর হীরু। তোমার বাবার আমলে, আমার বাবাও করত। নাকি?

অজয় কুমার সত্যি কথা বলছে। কিন্তু পশো, পশুপতি মাস্টার বলে দিয়েছিল, তিন বছরের বেশি সময় খুব লম্বা হয়ে যাবে। কাগজপত্রে সই সাবুদ, তিনের মধ্যেই রাখা চাই।

—সে ত বটেই। হক কথা বলছ তুমি। তোমার বাবা, আমার বাবার কথা বাদ দাও। তাঁরা সব স্বর্গে গেছেন। কথা হচ্ছে, তোমার হাল বলদ নেই—

—কোতায় পাব?

—তোমার বাবারও ছিল না।

—ছিল। আমাদের ঘরে গোয়াল ছিল। আমাদের

অল্প জমিজিরেতও ছিল। ঠাকুর্দার মামলায় সব বেচতে হয়েছিল। সে সব থাকলে আমি কোনদিন সহরে যাই? না তোমার জমিতে পাত পাততে আর ভাত কুড়োতে যাই?

—তার মানে তোমার নেই। তোমার ঠাকুর্দার ছিল। তোমার বাবারও কিছু ছিল। কিন্তু তোমার নেই। কোন-দিন ছিলও না।

—কোতায় পাবো?

—প্রতি বছর চাষের ষোল আনা খরচ আমার। তুমি এক ছেদামও খরচ করো না!

—কোতায় পাবো!

—আমি তোমায় মজুরি দি, পেট ভাতার খোরাকি দি!

—যখন কাজ থাকে দাও, না থাকলে দাও না।

—সে ত বটেই। যেমন পাঁচজনে করছে, আমিও তাই করি। তোমায় ফসলের ভাগ দি। যেমন নিয়ম আছে!

—তা দাও।

—তুমি সুখে দুখে হাত পাতলে যা পারি দি। দিই ত? তোমার মার ছেরাদে দিয়েছিলাম। তুমি এখনও সে টাকা শোধ দাওনি!

—কোতায় পাবো?

—আমি ত মিথ্যে বলছি না। সব সত্যিই ত বলচি। কী গো?

—সত্যি!

—এই তিনটে কাগজে সই কর। প্রত্যেকটা কাগজে আলাদা করে তিন বছরের হিসেব আর তোমাকে যা দিয়েছি লেখা আছে। ভাল করে পড়। পড়ে সই করে দাও। দেখ, আমি অধম্মো কিছু করিনি।

—কী হবে সই করে?

—বর্গা আসছে।

—হাতির মাতা আসচে।

—কিন্তু ভাই, যদি আসে, আমাকে ত কাগজ পত্তোর দেখাতে হবে। দাও ভাই, সই করে দাও।

একবার নয়, দুবার অজয়কুমারকে ভাই বলেছিল হিরণ্য বোস। পাঠশালার সম্পর্ক।

—সই করলেই তোমার তুষ্টি?

তিনটে আলাদা কাগজে সই করে দিল অজয়কুমার। তারপর বলল, এইবার আমায় তিনটে ট্যাকা দাও হীরুবাবু। একটা ছোট্ট পাঁইট নিয়ে নেশা করি গে—

ওজো চাইলেই, হিরণ্য ওকে মদ খাওয়ার টাকা দেয়। এবং মুখে, মানি ব্যাগ খুলতে খুলতে, মদ খেতে নিষেধ করে।

হিরণ্যের পক্ষে সাবধানতার কাগজপত্রে ওজো সই করার পর, হীরু বোস টাকা দিয়েছিল। দাঁত বার করে হেসেছিল ওজো।

কিন্তু বর্গা যখন এল, ওজো দেখল, এটা সত্যি, গপ্‌প গুজব ভাঁওতা নয়, এটা ঘটনা, তখন সে যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠল।

সে পশো মাস্টারকে গিয়ে বলল, আমার হবে না?

পশুপতি মাস্টার বলল, তোর কী হবে না হবে, তার আমি কী জানি!

ওজো বলল, আমার যদি না হয়, ছিরের হলো কী করে?

ছিরে—ওজোদের নামো পাড়ার সৃষ্টিধর খাঁড়া—মিত্তিরদের সাড়ে তের বিঘে বর্গা করে নিল নিজের নামে। অথচ ছিরে ওজোর মতই শুধু চাষী। ভাগ চাষী নয়। তার বলদ নেই। লাঙল নেই। এক ছেদাম লগ্নী, তারও নেই।

মিত্তিরা থাকে জামশেদপুরে। তিন ভাই টাটায় কাজ করে। কালেভদ্রে বাড়িতে, গ্রামে আসে। কিন্তু চাষের সব খরচ প্রতিটি পাই পয়সা তারাই দেয়।

বর্গার সময় মিত্তিরদের এক ভাই ঝিমুটিতে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাতে কী! পশুপতি মাস্টার, শান্তি আইচ, ফিরু-মোল্লা—পশো, সেনো, ফিরু—সবাই ছিরের দিকে। চাষের খরচ যে মিত্তিরা দেয়, তার প্রমাণ কী? গ্রামে ত এনাদের টিকি দেখা যায় না। চাষের কাজ দেখাশোনা করে কে? ভূত? ভূতে এসে টাকা দিয়ে যায়? মিত্তিররা কাগজপত্র দেখাতে পারবে? মানি অর্ডারের রসিদ? না। কিছুই নেই।

থাকার ত কথা নয়। কারণ ঘটনা এই যে, ছিরে কি বছর চার পাঁচবার জামশেদপুর গিয়ে নিজে টাকা নিয়ে আসত।

কী বলছেন, ছিরের নিজস্ব হাল বলদ নেই? কে বলেছে? ছিরের দুটো মোষ পশুপতি মাস্টারের গোয়ালে আছে।

আমার গোয়ালে, আমি নিজে বলছি, আমার গোয়ালে

আছে, এই কথা বলতে বলতে পশো মাস্টার তার পৈতে জড়ানো হাত সকলকে দেখাল।

কলমের এক কোপে মিত্তিরদের সব, সৃষ্টিধর খাঁড়ার নামে বর্গা হয়ে গেল। মিত্তিরা ছিরেকে জমি থেকে হটাতে পারবে না। তার ছেলেকে না। নাতিকে না। এমনকি এই সম্পত্তি বেচতে হলে, যদি ন্যায্য দাম দেয়, তবে ছিরেকে আগে সাধতে হবে। আইন। ওজো যা। ছিরেও তা। দুজনে এক ছিল। আর রইল না। ওজো শুধু চাষী। ছিরে এখন ভাগ-চাষী। দুজনে এক ছিল। আর রইল না। এখন থেকে পাত আলাদা।

হিরুবাবুর জমির এক ছটাকও তার নামে বর্গা হল না ত! তার কি কিছুই হবে না?

—আপনি আমাকে করে স্থান সেনো বাবু।

একসময় পাঠশালার সহপাঠী, সেনো, শান্তি আইচকে 'আপনি' বলল ওজো। 'বাবু' বলল। সে কি মিনতি-ভরা উচ্চারণ! দারিদ্র্য মানুষকে অসহায় করে, মানুষের কাছ থেকে তার জাঁক কেড়ে নেয়।

দুর্গাপুর স্টিলে স্ট্রাইকের সময় তিনদিন হাজতবাস হয়েছিল সেনো বাবুর। হাজত থেকে বার হওয়া, ট্রেড-ইউনিয়নের সেকর্শনাল কমিটির ছোট নেতা, ঝিমুটির শান্তি আইচের জেল্লাই আলাদা। ঝিমুটিতে বর্গা আসার সময় সে হল নেতার নেতা।

—তুই কি ভাগ চাষী? তোর কি নিজের হাল বলদ আছে?

—সে ত ছিরেরও কোন কালে নেই—

—আবার বাজে বকে? পশুপতি মাস্টার ধমক দিয়েছিল।

—সরকারি খাসজমি কিছু আমার নামে বর্গা করে স্থান বাবু!

—সে সব ত আগেই বিলি হয়ে গেছে।

—মাদার ডোবা? কুবের পাড়?

—ওসব তো উটকপালে বেমভো ডাঙা।

—কুপিয়ে কুপিয়ে জমি করে নোব বাবু।

—সময় থাকতে আগে বলিস নি কেন?

—আগে বুঝিনি বাবু।

—চাষ করতে টাকা লাগে। টাকা কোথায় পাবি?

—বদদোমানের বেঙ্ক থেকে এনে স্থান বাবু। আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন। আপনি স্থাতা—

—ব্যাঙ্ক থেকে ওভাবে টাকা পাওয়া যায় না।

—তবে আপনি নিজে দেন বাবু—

—আমি কোথায় পাব?

—আপনার কত আচে। তিনটে হালের চাষ। পকোর। দুগ্‌গাপুরে চাকরি, ওরটাইম, বুনাস, আপনি স্থাতা—

—মানে? আমি চাকরি করি বলে নিজের চাষ নিজে করাই না? ভাগ চাষ করাই? এই গাঁয়ের লোক চাইলেই আমায় পায় কিনা, পাঁচজনে বলুক—

—আপনি সেনোবাবু, ভগমানের মত। না থাকলেও, সব থানে আচেন। আপনি স্থাতা—

—কীরে, ওহে সৃষ্টিধর, তোমার নামে বর্গা হল আর ওজো আমায় নিয়ে স্থাতা স্থাতা করে, এ কী আরম্ভ করল বলো ত!

শান্তি আইচের এই কথা শুনে, সৃষ্টিধর খাঁড়া ক'জনকে নিয়ে, তার দিকে প্রায় তেড়ে আসছে দেখে ওজো বলল, আমার ভুল হয়েছে, অন্যায় হয়ে গেছে বাবু। ঘাট মানছি বাবু। বলেন ত পা ধরছি—

—ঠিক আছে। যা।

—না।

—যাবি না?

—কিচু কিচু স্থান বাবু। কিচু নিয়ে যাই—

—কী চাস তুই?

—আপনার নিজের কিছু জমি আমার নামে বর্গা করে স্থান বাবু!

—কেন দোব?

—আপনি স্থাতা। সবাই বলবে স্থাতা পত্ দেখালে।

—তুই দিন দুপুরে নেশা করেছিস। স্থাতা স্থাতা করে করে কাজলামো হচ্ছে আমার সঙ্গে? তুই চলে যা এখান থেকে—

—আমার পরাণটা কেটে যাচ্ছে গো। এ কেমন আইন, যাতে মাত্‌তোর ক'জনের হয়, সবাইকার হয় না? আপনি যে বলেন এতিহাসের চাকা ঘুচ্‌চে—

—ঘুরছেই ত। সর্বহারার হাত দিয়ে ঘুরচে।

—আপনার হাত দিয়ে ঘুচ্‌চে বাবু। এতিহাস আপনার। আপনি স্থাতা।

—তুই সীমা ছাড়াচ্ছিস ওজো। তোর মাতলামি বন্ধ করবি কিনা—

অজয় কুমার হঠাৎ একেবারে অন্য কথা বলতে বলতে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

—আপনারা বলচেন লাঙল যার, জমি তার। যে পয়সা দিয়ে লাঙল কিনল লাঙল শুধু তার হল, আর এই দু হাত যে লাঙল ঠেলছে, লাঙল এই দু হাতের নয়?

এ সব বেশ ক বছর আগের কথা।

মানুষ নিজের কথা ছাড়া, নিজের সমস্যা ছাড়া অন্যেরটা বিশেষ মনে রাখে না। এটাই নিয়ম। বিশেষ মধ্যবিত্তদের ক্ষেত্রে ত বটেই। একদা মিত্তিরদের জমি ওইভাবে বর্গা হওয়া হিরণ্যের কাছে অন্যায় মনে হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে যে মতলব, অন্যের জিনিস দলবেঁধে হাতিয়ে নেওয়ার যে খেলা আছে তা সে টের পায়নি। বর্গা হওয়ার পর, পর পর দু'বছর তার জমির ধান, আরও কারও কারও ধান লুঠ হল। কিছু জমিতে ঝাণ্ডা পোঁতা হল। কিন্তু মিত্তিরদের জমি, যা ছিরের নামে বর্গা করা হয়েছে, তাতে কিছুই হল না।

পশুপতি মাস্টার, শান্তিময় আইচ, ফিক মোল্লা, এরা ত ছিলই, গত ৭ বছরে ছিরেও গ্রামের 'একজন' হয়ে ওঠেছে। সে শুধু আর ছিরে নেই। সে এখন সৃষ্টিধর। দাপটে পশো, সেনো, ফিকর মাথায় মাথায় না হোক, কপাল বরাবর ত বটেই। কথা ছিল, মিত্তিরদের বর্গা হওয়া জমি, ছিরের বেনামীতে কিনে নেবে পশো আর সেনো দু জনে মিলে। অবশ্যই জলের দরে কিনবে। কিছু টাকা যে মিত্তিরদের ধরে দেবে এই ত অনেক। আর মিত্তিররা যদি বেচতে না চায়, না বেচুক। তাদের জমিতে চাষ ঠিকই হবে, মিত্তিররা এক পয়সার ভাগের ফসলও পাবে না। জমি তোমার। কিন্তু তোমার নয়। যা করবে করো। কথা ছিল, পশো মাস্টার আর সেনো আইচ দু জনের টাকায় ছিরের বেনামীতে কেনার পর, ছিরে কাগজে লেখা-পড়া করে, পঞ্চায়েতকে সাক্ষী মেনে ওই জমি বন্ধক রাখবে পশো মাস্টার আর সেনোবাবুর কাছে।

মিত্তিরদের জমি জলের দরে বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু ছিরে বন্ধক রাখে নি। কেনা জমিতে চাষ করে, টাকা শোধ দিয়ে দিয়েছে। সেও এখন জমির মালিক। সিডিউল পাড়ার ভোট ব্যাঙ্ক তার হাতে। তার দাপট এখন অনেক। তার হাত অনেক লম্বা। গ্রামের ভাষায়, সৃষ্টি হল, 'গাঁয়ের একজন'। বদদোমানের নেতারা বলে, সৃষ্টিধরবাবু।

এই হল অবস্থা আর ব্যবস্থা। এই অবস্থা আর ব্যবস্থায় জমির দাম কেবল পড়তি। বেচতে পারো। খদ্দেরও আছে। কিন্তু দাম পাবে না।

গত সাত বছর ধরে হিরণ্যর বুকের ভেতর তুপ্ তুপ্ করে। কেন করে, তা হিরণ্যর ছেলেরা বোঝে না। তার স্ত্রীও বোঝে না। তারা ঝিমুটিতে আসতে চায় না, আসেও না। তাদের কোন টানও নেই। না ভিটের। না মাটির। তারা কলকাত্তাইয়া।

দু বছর, ৮৫, ৮৯তে ধান লুঠ হওয়ার পর তবু যা হোক চলছিল। সে বিপদ, ধান লুঠ, ঝাণ্ডা পোঁতা এ সব আর নেই।

কিন্তু এখন আবার হাওয়ায় বুনো হাতির গন্ধ। সামনে পঞ্চায়েতের ইলেকসন, স্থিতাবস্থা না ভাঙলেও, ঝিমুটি গাঁয়ে সবাই চান আবার নতুন কিছু, হাওয়া যেন তাই নড়ে চড়ে বসছে। সামনের পঞ্চায়েত ইলেকসনে হার জিত যার ও যেভাবেই হোক, আরও কিছু দাবিদার এসে গেছে। তারা ভুস করে ওঠেনি। টুপ করে ডুববে না।

এই জন্য হিরণ্যর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং জমির দর আবার বাড়ছে।

বেশ তেজী। কলকাতায় জমি ও বাড়ি কেনা বেচার মত, কিছু লোক এখানেও দালালের কাজ করছে—পার্ট টাইম যদিও, কলকাতার মত ফুলটাইম নয়। এবং কলকাতার মতই এখন গ্রামেও ঘটক, দালাল ও ইয়েদের আলাদা করে চেনা যায় না। জমির যা দাম তার অর্ধেক হবে কালো টাকায়। যে কিনবে সে রেজিস্ট্রির সাত দিন আগে নগদে কালো টাকা দেবে। রেজিস্ট্রির সময় চেকে বাকি টাকার পেমেণ্ট। এতে কোর্ট ফি কম। আয়কর এবং আরও অনেক মামলা থেকে সহজে বাঁচা যায়।

গত দু' মাসে—কার্তিক, অঘ্রাণ—পাঁচবার ঝিমুটি এসেছে হিরণ্য। আজ সকালে ফার্স্ট লোকালে গ্রামে পৌঁছে, সে এখন ওজোর কুঁড়ে ঘরের দরজায়, এই নিয়ে ছ' বার। ভাল বাংলায়, ষষ্ঠবার আসা হল। এত ঘন ঘন সে কলকাতা থেকে বহুকাল বাড়ি আসেনি। এই আসাই হয়ত তার শেষ আসা। এর পর ঝিমুটিতে শুধু তার বাপপিতামহর বাস্তুটুকু থাকবে। তাও কতদিন? ভেবে লাভ নেই।

কুলতলি তুই যা। নগদ টাকার ওজন তোর চেয়ে বেশি।

কিনবে চারজন। ছিরে, পশো, সেনো, ফিরু। চারজনের সমান ভাগ। কিন্তু জমিতে আল উঠবে না। জমি ভাগ হবে না। ১১ বিঘে ৭ ছটাক, এক হাতায় যেমন আছে, তেমন থাকবে। রেজিস্ট্রি সে ভাবেই হবে। এক হাতায়, অতবড় সোনা ফলানো মা লক্ষ্মীকে ভাঙতে নেই।

দাম, ৮০.০০০৲। ৬০,০০০৲ টাকা কালো। চারজনের প্রত্যেকে ১৫ করে। কিন্তু সিরাজুল আর তার কাকা জালাল, ১ লাখ দিতে চেয়েছে। বাঁকা ঘোষরা দর দিয়েছে, ১ লাখ ১০। এই দাম এবারের ধান কাটার পর। ধানের দাম আলাদা।

তুমি কিন্তু ক্সাজে খেলছ হীরু। মনে রেখ, বর্গার সময় আমরা তোমার পাশে ছিলাম। না হলে বর্গার হাঙ্গামা হত। তা ছাড়া গাঁয়ের পাট ত তুলে দিচ্ছ না। তোমার বাস্তু। গাঁয়ের বামুন বাড়িতে তোমার গৃহদেবতা রঘুনাথের পুজো। এসবই ত থাকল। রিটায়ার করে ঘরে এসে থাকবে বলছ। আমাদের নাতি মেরো না হে। মনে রেখ, যাকে রাখ, সেই রাখে।

ওরা চারজন এই কথাগুলো সাফ সাফ বলে দিল। রফা হয়ে গেল ৯০,০০০। ধান সমেত। লাখ হলেই ভাল হত। মনটা খিচ্ খিচ্ করছ। করুক। এসবের পর এরা ত অন্তত পাশে থাকবে। থাকবে?

আজ হিরণ্যর অনেক কাজ। ক্রেতা চার জন প্রত্যেকে আজ পঞ্চায়েতের মিটিং-এর পর হিরুকে ১৮,০০০ করে মোট ৭২ হাজার টাকা দেবে, চারটে আলাদা চেক-এ। সেই চারটে চেক নিয়ে আজই হিরণ্য কলকাতা ফিরে যাবে। চেকগুলি, তার অ্যাকাউন্টে জমা হতে, হিরণ্যর অনুমান, প্রায় ৩ সপ্তাহ লাগবে। কারণ প্রতিটি চেকই বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বর্ধমান শাখায়। আর তার অ্যাকাউন্ট কলকাতায়। বর্ধমান থেকে চেকের টাকা ত এক ফুঁয়ে কলকাতায় উড়ে যাবে না। লোকালে যাবে। সময় লাগবেই। শেয়ার কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ার পর ব্যাঙ্কের সব স্তরের বেশির ভাগ কর্মচারি নাকি সব কিছুই আগের থেকে আরও বেশি খুঁটিয়ে দেখছে, তাই ব্যাঙ্কের যে কোন কাজেই আগের চেয়ে আরও বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, এসব কথাও হল। কারণ গাঁয়ের মাতব্বরদের মধ্যে যখন কথা হয়, তখন পৃথিবীর কোন কথাই বাদ থাকে না।

সে যাক। চার জন চেক দেবে চার জনের প্রতিনিধির সামনে। চার জনের পক্ষে চার সাক্ষী! তারপর রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে, এদের চারজনকে ১০০০৲ টাকা জলপানি দেবে হিরণ্য। মাথা পিছু ২৫০৲। দালালি। রাজি?

রাজি।

কোর্ট ফি, উকিল, মুহুরী, এসব খরচা হিরণ্যর। ঠিক আছে। এতটা এগিয়ে, পিছিয়ে আসার মানে হয় না। বর্ধমানের ব্যাঙ্ক থেকে চেকগুলো হিরণ্যর পাশ বইএ ঢোকার আগে ব্যাঙ্ক কমিশন বাবদ বাদ যাবে কিছু। ওদের চেকগুলো ক্যালকাটা ব্রাঞ্চের হলে এটা হত না। উপায় নেই।

এই সব নানা কথা ও হিসেব মনের চোরাকুঠরিতে নাড়াচাড়া করতে করতে হিরণ্য বোস, তার কিরষেণ ওজো, পাঠশালার এক সহপাঠি অজয়কুমারের সঙ্গে কথা বলছিল। কিন্তু কথায় কথায় ওজো যখন জানাল যে তার ছেলে, ৮৫ আর ৮৬, যে দুবছর কুলতলির সব ধান লুঠ হয়ে যায়, সেই দু বছর ওজোর ছেলে এসে তার বাবার হাতে নয়, মায়ের হাতে বাবা আর মায়ের পেট চালাবার টাকা দিয়ে গেছে, এবং তারপর আর এক পয়সাও ঠেকায় নি— মানে বাবা নয়, বাবা তো মগুপ, তাই মায়ের হাতে টাকা দেওয়া এবং তাও মাত্র ৮৫ আর ৮৬, যে দুবছর ধান লুঠ হয়েছে, তারপর আর নয়—বাবা মাতাল, তাই কি?·· হিরণ্য মনে মনে সত্যিই অবাক হল।

ওজো, ওজোর ছেলে এতই বিচক্ষণ? তাকে হিরণ্য কোনদিন দেখেনি। হিরু বোস ক মিনিটের জন্য সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

ওজোকে হিরণ্যর একটা জরুরি কথা জানানোর আছে। সেনো, ফিরু, পশো বা ছিরে সে কথা বলবে না। হিরণ্যকে জানাতে হবে। এবং হবেই। হিরু যে তার কুলতলি বিক্রি করে দিচ্ছে, এ কথা অজয়কুমারকে জানাতেই হবে। বিশেষ, ফসল কাটার আগেই যখন ধান ভরা জমি হাত বদল হচ্ছে। ওজোর চাষ করা জমি। এ বছর কুলতলির ফসলে ওরও ভাগ আছে। আর ও জানবে না? আগে ওজোকে জানাতে হবে। তারপর পঞ্চায়েতকে। এটা কোন আইন নয়, তবে এটাই রেওয়াজ। পঞ্চায়েতকে না জানিয়ে, পঞ্চায়েতের অগোচরে কিছু হতে পারবে না।

এই যে গিয়ে বলা, তা নিয়ে দুটো কথা হল, এই হল পঞ্চায়েতের মান। গণতন্ত্রের মান। এই মান রাখতেই হবে। যেমন শিবঠাকুরের মাথায় ভুজঙ্গ।

আর কুলতলি হস্তান্তরের ব্যাপারে ত আরও বিশেষ ভাবে বলা দরকার। আজকাল এমনিতেই সেনো, ফিরু, পশো, ছিরে নানা আলোচনার বস্তু। কথায় কথায় ওদের দিকে আঙুলও উঠে যায়। অনেক জিব লক্ লক্ করছে। মাস তিনেক আগে, একবার ত ঝিমুটিতে ওই চারজন সমেত পুরো পঞ্চায়েত ঘেরাও হয়ে গেল। নাইট স্কুল, সমবায় ভিত্তিক স্বনির্ভর মৎস্য চাষ, এই দুদলের ছেলেরাই আলাদা আলাদা ভাবে এসে, একসঙ্গে পঞ্চায়েত ঘেরাও করল। বোঝ ঠ্যালা। তারপর সহরে বিশেষ করে কলকাতায় যেমন হয়, ঠিক তাই হল। গ্রামের অন্য কিছু যুবক এসে ঘেরাওকারীদের সঙ্গে মিলে গিয়ে খুব গরম গরম কথা বলে বলল, আমাদের সঙ্গে বসতে হবে।

পঞ্চায়েত আলোচনার একটি দিন দিল। ঘেরাও উঠে গেল।

হিরু বোস বলল, তোমার সঙ্গে বিশেষ দরকারি কথা আছে ওজো।

—তা বলা হোক সেটা।

—এখানে হবে না। মাঠে যেতে হবে।

—ধান দেখবে?

—ধান দেখা, কাজের কথা, সব একসঙ্গে হবে। ছিরেও থাকবে।

—ছিরে কেন? ও···কী করবে?

—ওকে দরকার।

কুলতলির হবু ৪ জন ক্রেতা, সকলেই যদিও গ্রামেরই—পঞ্চায়েতের কার্যকরী সমিতির সভা আছে বলে শান্তিময় আইচও দুর্গাপুর থেকে এসেছে, না এলে নিজে হাতে চেকটাই বা হিরুকে দেয় কী করে—তবু ওরাই পরামর্শ করে স্থির করছে যে হিরণ্য যখন অজয়কুমারের সঙ্গে কথা বলবে তখন ছিরে সেখানে থাকবে। অন্য তিনজন নয়। ওজো, হিরু আর সঙ্গে ওরা চারজন হলে মনে হবে সভা হচ্ছে।

—আমি তাহলে একটা ডুব দিয়ে চাট্টি পান্তা খে নি। তারপর আসচি—

—তাড়াতাড়ি এস। বিশের দিঘির পাড়ে আমরা বসব। আমি ছিরেকে ডেকে আনছি।

—হিরুবাবু, কিছু দেওয়া হবে না? এই বলে ওজো হাত পাতল।

—কী দোব?

—যা দাও গো। পাঁচটা টাকা দাও। একটা ছোট পাট।

—এই সকাল বেলায়?

—তুমি এয়েচ বলে ইস্‌পিসাল। অন্যদিন সকালে খাইনা। কোথায় পাব? ছেলের দিব্যি—, আমি সকোলের কাছে হাত পাতি না।

হিরণ্য তাকে পাঁচ টাকা দিল।

বিশাল বিশের দীঘি। বিশ বিঘে জল।

হিরণ্য আর সৃষ্টিধর বিশের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখল, ওজো একটা খেজুর গাছে উঠেছে। সে দুই দাঁতে চেপে ধরা হাঁসুয়াটা হাতে নিয়ে গাছের আগায় ছোট ছোট ফুটো করে একটা মাটির হাঁড়ি বাঁধল। তারপর গাছ থেকে নেমে ওদের কাছে এল।

হিরুর পরণে ফুলপ্যাণ্ট, শার্ট, সোয়েটার। পায়ে মোজা ও চটি। সৃষ্টিধরের হাঁটু পর্যন্ত ধুতি মালকোচা দিয়ে পরা। গায়ে ফতুয়া আর চাদর। চাদরের ফাঁক দিয়ে ফতুয়ার তলায় কটন উলের গেঞ্জি। পা খালি। ওজোর পরণে ময়লা জ্যালজেলে লুঙি। হাঁটু পর্যন্ত ফেত্তা দিয়ে তোলা। গায়ে ছেঁড়া জামা। কোমরে বেড় দিয়ে একটা ময়লা গামছা নাইকুণ্ডুর কাছে ফাঁস দিয়ে বাঁধা। গামছা আর কোমরের ভাঁজে হাঁসুয়াটা গুঁজেছে। কোমরে হাঁসুয়ার পাশে আধখানি ছোট পাঁইট উঁকি দিচ্ছে। মাঝে মাঝে পাঁইট আর হাঁসুয়ায় লেগে শব্দ হচ্ছে।

—বোস অজয়।

অজয়। অজয় কাহার। পাঠশালার নাম। অজয়কুমার দুই ভ্রূ কুঁচকে তাকাল হিরণ্যর দিকে। তার চোখ লালচে থেকে লাল হচ্ছে। কপালে ঘাম।

উবু হয়ে বসল ওজো।

—যে কথা বলার জন্যে আসা, এই বলে হিরণ্য থামল। দূরে কুলতলির মাঠভরা ধানের দিকে সে তাকিয়ে আছে।

—কী হে, তাড়াতাড়ি আসল কাজের কথা সারো, ছিরে তাড়া দিল।

হ্যাঁ, এখন এভাবেই সমানে সমানে কথা বলে সৃষ্টিধর। আগে ভুলেও বলত না। গত ৩/৪ বছর বলছে।

—ওজো, কথাটা তোমাকে বলছি—কী বলছি মন দিয়ে শোন। তোমার হুঁশ আছে ত?

—খুব।

—কুলতলি বিক্রি করে দিচ্ছি। ধান সমেত।

—কে কিনছে?

—এরা।

—কারা ?

—সৃষ্টিধর, পশো মাস্টার, সেনো আইচ—এদের ছেলে আর ফিরুমোল্লার নাতি।

—এমন সব্বোনাশ কেন করলে হীরুবাবু! পেটের জন্যে আমাকে তুমি ছিরের পায়ে ধরাবে ?

—জমি তুমিই করবে। আমি কথা বলে নিয়েছি। কী হে ছিরু—

সৃষ্টিধর কিছু বলার আগেই ওজো বলল, আমার তা'লে চারটে ভাতার। আমি চার ভাতারি ?···দাদ্‌দা গো, দিদ্‌দি গো, সোন্‌নার পিত্‌তিমেখানি, কোত্‌তায় রেখ্‌খে এল্‌লি গো—···

—মাতলামি পরে করিস, তোর কিছু বলার থাক্‌লে বল্, সৃষ্টিধর ধমক দিল।

—এদ্‌দিনে তোদের মেনোসকামনা পুন্‌নো হল ছিরে ? কুলতলিকে শেষতক, তোরা চারজনে গিললি তাহ্‌লে! গিলে খেলি ? থাকত আমার দাদু ভুজো ডাকাত, দেখতাম তোরা কে কে বাপের ব্যাটা···পরপর দু বছর তোমার কুলতলির ধান কারা লুঠ করিয়েছে, জানো হীরুবাবু ? এই চারজন। সব তোমার বনদুগো। যাতে তুমি বাপ্‌ বাপ্‌ বলে জমি বেচে দাও—···

ওজোর কথা শেষ হল না। এক ঝটকায় ওজোকে মাটিতে ফেলে সৃষ্টিধর ওর গলা টিপে ধরেছে। ডান পা দিয়ে অজয়কুমার ছিরের পেটে লাথি মারল। ছিটকে পড়ল সৃষ্টিধর। ওজো লাফ দিয়ে এসে ছিরের বুকের ওপর বসে চিৎকার করতে করতে কোমর থেকে হাঁসুয়া বার করছে, 'তোর জমিদারি ঘুচিয়ে দোব আজ।' পিছন থেকে দুই হাতে ওজোর গলা ধরে তাকে টানল হিরণ্য। অজয়কুমার হেলে এক কাত হতেই সৃষ্টিধর উঠে দাঁড়াল। হিরুও ততক্ষণে ওজোকে ছেড়ে দিয়েছে। ওজো ছুটে গেল ছিরের দিকে। তার চোখ জ্বলছে। কপাল দপ্‌দপ্‌। চুল দাউ দাউ। ঠোঁটের কস গড়াচ্ছে। পালাচ্ছে সৃষ্টিধর। পালাচ্ছে। পালাতে পালাতে বিশের দীঘির ঢাল বেয়ে নামছে।

হিরণ্যর দিকে ঘুরে দাঁড়াল অজয়কুমার।—'খুন করব। কলকাতার খচ্চোর। তোরা সব এক জাত। তোর রক্ত খাব।' হিরণ্যর সামনে জগৎ সংসার দুলছে। সে পালাচ্ছে। পালাচ্ছে! পিছনে যম। চক্‌চকে হাঁসুয়া হাতে ধেয়ে আসছে ওজো।

একটা ছই বিহীন গরুর গাড়ি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। গরুর গাড়ির সামনের দিকটা লাফ দিয়ে পার হল হিরণ্য। হিরণ্যর দুই পায়ে এখন শুধু মোজো। পিছন থেকে ধেয়ে আসা অজয়কুমারও লাফ দিল। লাফাতে গিয়ে ওজোর বাঁ পায়ের পাতা জড়িয়ে গেল পড়ে থাকা গরুর গাড়ির সামনের দিকের বাঁশে।

পড়বার সময় ওজোর গলা নেমে গেঁথে গেল তারই ডান হাতের খোলা হাঁসুয়ার ওপর। মাত্র কয়েক পলক।···রক্ত। রক্ত। রক্ত। লাল, তাজা, গাঢ়, গলার নালি থেকে ফিনিক দেওয়া টকটকে রক্ত। তবু মাটি আঁচড়ে, ধনুকের মত বেঁকে, টাল খাওয়া খেজুর গাছের মত ঝুঁকে, অনেকটা খাড়া হল অজয়কুমার। সেই অবস্থায় নিজের বাঁ হাতের এক হ্যাঁচকায় গলা থেকে হাঁসুয়া খুলে নেওয়া মাত্র ঝুলে গেল ওর গলা, মুখ মাথা লট্‌পট্‌ করছে। তবু সামনের দিকে এক পা ফেলল অজয়কুমার। আর এক পা টানার আগেই ঝিমুটির মাটির ওপর ধপাস করে পড়ে গেল। জালে আটকানো ঢাউস মাছ, চেকির পাড়···আছড়াচ্ছে অজয় কুমার। লড়ছে।

ওজোর মৃত্যুর পরদিনই ছ'টা শোক সভা হল গ্রামে। অদ্ভুত সাংগঠনিক তৎপরতা। কলকাতা হার মানে। প্রথম শোক সভা গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে। পঞ্চায়েতের যেহেতু কোন নিশেন নেই, তাই পতাকা আধথানা নামানো গেল না। তবে মৃতের প্রতি সম্মানে পঞ্চায়েত তিনদিন বন্ধ ঘোষণা করা হল। পঞ্চায়েতে নেওয়া শোকপ্রস্তাবের গৃহীত খসড়া নিয়ে কজন নামো পাড়ায় ওজোর খড় ছাওয়া এক চালা ভিটেয় গিয়ে শুনল, ওজোর বিধবা ঘরে নেই। সে রোজকার মতো গতর খাটাতে গেছে। গতর খাটাতে যাওয়া মানে, নির্দিষ্ট ক'টি বাড়িতে বাঁধা কাজ করতে যাওয়া।···পঞ্চায়েতের শোক সভার পর, পরপর দুটি আলাদা শোক সভা হয়েছে ঝিমুটির, এখনও পর্যন্ত দুটি প্রধান পার্টি অফিসে। দু'জায়গাতেই ৭ দিনের জন্য দলীয় পতাকা আধখানা নামানো—যাকে অর্ধনমিত বলে—থাকবে। দুটি আলাদা শোক সভা আলাদা আলাদা পাড়ায় করেছে নাইট স্কুল ও স্বনির্ভর সমবায় ভিত্তিক মাছ চাষ প্রকল্পের যুবকেরা। ষষ্ঠ শোক সভা হয়েছে প্রাইমারি স্কুলে। এককালে এই

প্রাইমারি, যখন শুধু পাঠশালা ছিল তখন ওজো, পশো, সেনো, হীরু, ছিরে ফিরু, সবাই ছিল এখানকার ছাত্র। ফিরু ছাড়া ওরা পাঁচজনে ছিল সহপাঠী। সতীর্থ। তখনকার দিনে ওদের পাঁচজনের ভাব আর দুষ্টুমির জন্যে গাঁয়ের বড়োরা বলত : পঞ্চপাণ্ডব।

ওজোর বিষয়ে স্মৃতি চারণ করার সময়, পঞ্চপাণ্ডব ইত্যাদি বলার সময় পশুপতি মাস্টারের গলা যে কান্নায় বুজে আসছিল, পশো মাস্টার যে কেঁদেছে, তা উপস্থিত সবাই নিজের চোখে দেখেছে। ঝিমুটির ছেলে ও ঝিমুটির স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র অজয়কুমার কাহারের সম্মানে স্কুল তিনদিন বন্ধ বলে ঘোষণা করা হল।

বন্ধুদের পরামর্শে ছ'টি শোক সভাতেই উপস্থিত থেকেছে হিরণ্য। সেও তার ছেলেবেলার সহপাঠী সম্পর্কে দু'চার কথা বলেছে। আর প্রতিবারই তার মধ্যে একটা অপরাধ বোধ, কিংবা তার চেয়েও বেশি, অস্বস্তি করেছি, না বুঝে পাপ করেছি এরকম একটা বোধ হিরণ্যর দু চোখের কালি হয়ে, তার সারা শরীরে ছায়া ফেলেছে। ফেলছে।

ওজোর একটা কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ওজো বলেছিল : পেটের জন্যে আমাকে তুমি ছিরের পায়ে ধরাবে ?

এককালে নিজের গান, আর নিজস্ব নাচ ছিল ওজোর। সে গান বাঁধত। সেই সব গান, নাচ, স্বাস্থ্য, তার যা কিছু আমোদ, সব চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার মান, নিজের কাছে নিজের মান, মরবার আগে পর্যন্ত যায়নি। '···আমাকে পেটের জন্যে তুমি ছিরের পায়ে ধরাবে ?' ওজো ধরেনি।

ইতিমধ্যে একবার বর্ধমানের থানায় ঘুরে আসতে হয়েছে হিরণ্যকে। সঙ্গে বন্ধুরা ছিল। বড় দারোগার কাছে অজয়কুমার কাহারের মৃত্যুর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিতে হয়েছে। বিবরণ তথা এজাহার খুব সরল। ওজো সব সময়ই মদ খেত। সেদিন সকালেও খেয়েছিল। টলছিল। রাস্তার ওপর গরুর গাড়ির সামনের দিকটা পার হতে গিয়ে পা লেগে উল্টে যায়। তখনই বেকাদায়—

—আপনাদের ঝিমুটির পোলিটিকসের সঙ্গে এর কোন ব্যাপার নেই বলছেন ?

—মোটেও না। কোন পার্টিই ত ওকে নিজেদের কর্মী বা সমর্থক বলে দাবি করেনি দারোগা বাবু। করেছে কি ?

—তা সাত সকালে ওর হাতে কাস্তে এল কোথা থেকে।

—কাস্তে নয় ছার, হেঁসো। হাঁসুয়া, ছিরে বলেছিল।

—কাস্তে আর ওই যে কী বললে, হেঁসো, তফাত আছে নাকি ?

—তা একটু আছে ছার।

—কই দেখি, ওই কাস্তেটা একবার আনো ত, দাঁড়িয়ে থাকা সেপাইকে বড় দারোগা হুকুম দিলেন।

কাস্তে বা হাঁসুয়া বা হেঁসোটা থানার কোথাও পাওয়া গেল না।

বড় দারোগা ক্রুদ্ধ হলেন। ছোট দারোগা বললেন, ও স্যার একটা কিনে আনলেই হবে।

—তাহলে যাও। এখুনি যাও। কিনে আনো। এঁদের কাউকে নিয়ে যাও। আর শোনো, যে কোন মাংসের দোকান থেকে ওটা রক্তে চুবিয়ে এনে রোদে ফেলে রাখ। তোমাদের মাথায় তো কিছুই আসে না—একটা কেস ডায়েরি করে সব আমায় উদ্ধার করে দিলে ? হুঁ:।

থানার জিপে সেপাইদের সঙ্গে ছিরে গেল। ফিরল রক্ত মাখা হেঁসো নিয়ে।

—তা ওটা সাত সকালে ওর সঙ্গে ছিল কেন ?

—ও ত গাঁয়ের মজুরদের সঙ্গে থাকে, ছার।

—কেন থাকে ?

—পোয়াল কাটে—

—পোয়ালটা কী হলো ?

—গরু ছাগলকে খাওয়ানোর ঘাস! তা ছাড়া ওই দিয়ে ঘুটো করে রসের হাঁড়ি বাঁধ। এখোন খেজুর রসের সিজন···

হিরণ্য অবাক হয়ে ভেবেছিল, হাঁসুয়ার লেগে থাকা রক্তের যদি ক্রিমিকাল টেস্ট হয়, তাহলে ?

এখনও মানুষটারই কাটা ছেঁড়া হয়নি। ফুঃ। নাকি পড়ে থাকা, বেওয়ারিশ লাশ বলে বেপাত্তা হয়ে যাবে ? কে জানে। থানায় রাখা হাঁসুয়ায় কার রক্ত ? কোন্ জানোয়ার ? পুরুষ ? না স্ত্রী ?···হাঁসুয়ার দিকে চেয়ে বড় দারোগা ইংরেজিতে বললেন : অদ্ভুত মৃত্যু।

ওজোর মৃত্যুর পর আজ চতুর্থ দিন। ঝিমুটিতে আটকে গেছে হিরণ্য। এখন সকাল ১০টা। আর ৬ ঘণ্টা

পরে, বিকেল ৪ টের লোকালে হিরণ্য কলকাতা চলে যাবে। ওঃ। এখানকার বাতাস মাঝে মাঝেই চেপে বসছে তার ভেতরে।

কথা ছিল কুলতলির ক্রেতা ৪ জনেই তাকে ১৮০০০৲ টাকা করে ৪ টে চেক দেবে। এখন তারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা করে নানা অঙ্কের চেকে ১৮ই দেবে, তবে ১টা নয়, এক একজন ৩ বা ৪ টে চেক দেবে। গোপন টাকা। গোপন অ্যাকাউন্ট। ২, ৩, ৪ নং অ্যাকাউন্ট। হিরণ্যকেও সেভাবে এগুলি তার পরিবারের নানা জনের নামে ছড়িয়ে দিতে হবে। চেকগুলি সেভাবেই লিখতে বলেছে। হিরণ্যর চারটি অ্যাকউন্ট। নামে নামে। তার। তার স্ত্রীর। ছেলের। মেয়ের। গতকালের কাগজে একটা খবর ছিল: কালো টাকা উদ্ধারের জন্য বিশেষ সেল···।

এমন সময় উঠোনের ভেজানো দরজা খোলার শব্দ হল। নিচের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। সে উঠোনের মাঝখানে কয়েক সেকেণ্ড থেমে, সোজা এসে হিরণ্যর ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

এক কালো, টানটান যুবক। তার পরণে কাছা। তার অশৌচ।

—তুমি কে?

—আমি বিজো। ৺কুঞ্জ কাহারের নাতি। ৺অজয় কুমার কাহারের ছেলে।

ঠাকুর্দা আর বাবার নাম বলার সময় ঈশ্বর ও দু জনেরই উপরি সমেত পুরো নাম বলল সে।

—আমার কাছে কেন?

—আপনার জমি আমি চাষ করব।

—আমার জমি তোমার বাবার নামে বর্গা করা নেই। সে কাজ করত, মজুরি আর—

—তাতে কী হয়েছে? আপনার জমিতে ঠিকে খাটত, বর্গা নেই বলে, আমার বাপ পেতামোর চাষ করা জমি থেকে উচ্ছেদ করবেন নাকি? তা হবে না—

তার দিকে আবার ভাল করে, খুঁটিয়ে দেখল হিরণ্য। চওড়া কাঁধের ওপর শিলের নোড়ার মত ঘাড়। সেই ঘান পেটানো তক্তার মতো পায়ের পাতা। ৺অজয়কুমারের ছেলে বিজয়কুমার।

—আমার জমি বিক্রি করে দিচ্ছি।

—বর্গা করা থাকলে, কেনার হক ত আমারই হত। আমায় বঞ্চিত করবেন না—

—তুমি তো অনেক জানো দেখছি।

হ্যাঁ জানে। সে জানে। সে পানাগড় বুদবুদ দেখেছে। সে মদ তৈরি করতে জানে। সে ত শুধু মদ তৈরি করত না। বাবুদের জমিতে কি বছর বর্ষাকালে চাষও করত। শুঁড়িখানার কাজ করত বলে তার বেশ কয়েকবার কম-মেয়াদি হাজত হয়েছে। একবার আসানসোলের জেলে চালান হয়েছিল। সেখান থেকে কলকাতা। ঝিমুটি, বর্ধমান, পানাগড়, বুদ্‌বুদ্‌, আসানসোল, কলকাতা, পেট, কৃষিকর্ম, করবরী পাতা—করবীগাছের পাতা—মিশিয়ে বেআইনি চোলাই, রেলস্টেশন, বাসগুমটি, শুঁড়িখানা, জেল-খানা···ওজোর ছেলে, বিজোও দুনিয়া দেখেছে। এত কথা বলে সে বলল, বিশ্বাস করুন, চাষ করতে জানি। সব জানি। এক বছর দিয়ে দেখুন—

—তার থেকে কিনে নাও। কিনবে?

—কত দাম?

—এক লাখ।

হাঁ হয়ে গেল বিজয়কুমার। কিছুক্ষণের জন্য বোবা। তারপর বলল, কিনব। যদি আপনি বাধ্য করেন—।

আশ্চর্য! সে কুলতলিকে বারবার তার বাপপিতামোর জমি বলছে।

সে টাকার জন্যে যাবে পানাগড়ে তার মালিকের কাছে। বিজো তার জন্যে জেল খেটেছে। তার মালিক বেইমান নয়। তাছাড়া মালিকের টাকায় জমি কিনে, সে ত যতদিন না দেনা শোধ হচ্ছে, কেনা জমির সব দলিল মালিকের কাছে বন্ধক রাখবে। সুদ দেবে। আসলও শুধবে একটু একটু করে।

হিরণ্যকে অবাক করে দিয়ে, হিরণ্যর কোন রকম অনুমতি না নিয়েই সে বসে পড়ল সামনের চেয়ারে। বসে কোমর থেকে একটা হাঁসুয়া বার করে হিরণ্যর বিছানা ও যে কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ারটায় সে বসেছে, বিছানা ও চেয়ারের মাঝখানে ছোট টেবিলের ওপর রাখল।

টেবিলে হাঁসুয়া রাখার হাল্কা শব্দে ও সেটা হঠাৎ চোখের সামনে দেখেই শিরদাঁড়া শির শির করে উঠল হিরণ্যর। হঠাৎ তার মনে হল, এই ছেলেটা তাকে খুন করতে পারে। হিরণ্য দেখে নিল তার ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু এই ঘর

থেকে পালাতে হলে ওই যুবককে ডিঙিয়ে পালাতে হবে। যেমন ডিঙোতে গিয়েই পা লেগে লটকে গিয়েছিল ওজো।

হিরণ্য চোয়াল শক্ত করে বলল, এর মানে?

—এটা আমার বাবার সেই হেঁসো। পুলিশ এল, কত লোক এল, কিন্তু কেউ এটা নেয়নি। এটা কুড়িয়ে এনেছে আমার মা। এনে ধুয়েছে—

—এটা সঙ্গে রাখার দরকারটা কী?

—মা বলেছে নোয়া সঙ্গে রাখতে হয়। ছেরাদ হয়ে গেলে, এটা ঘরে রেখে দোব।

—এটাকে মাটিতে নামিয়ে রাখো। এই হেঁসো—

—না। আমার বাবার মান আছে। এই হেঁসো মাটিতে রাখব না, এই বলে সে হাঁসুয়াটা তুলে নিয়ে নিজের কোলের ওপর রাখল।

যুবকের চোয়াল শক্ত। চোয়াল, চিবুক, নাকের পাটা আর কপাল, বাপের থেকে আলাদা। মাথায় ওজোর থেকে কিছু লম্বা। এ অন্য ওজো। অচেনা। পুরো অচেনা।

সে আবার বলল, জমি বেচবেন না বোস বাবু। আমাদের উচ্ছেদ করবেন না—আপনাকে মিনতি করছি।

দূরে কে যেন কাউকে দূর থেকে গলা তুলে ডাকল—হা-রা-আ—। কার গোয়াল থেকে একটা গাই ডাকল—হা-ম-বা—আ—আ। একটা পাখি ডাকছে—কী-র-তি হো-ক, কী-র-তি হো-ক···

সে আবার বলছে, আমায় একবার সুযোগ দিন। শুধু একবার—

—তুমি পানাগড়ে ফিরে যাবে না?

—না।

—তুমি চিরকাল এই গাঁয়েই থাকবে?

—হ্যাঁ

—কী করে বিশ্বাস করব তোমার কথা? তুমি ত গাঁয়ে থাকো না। ছিলে না।

আর কোনদিন কোতাও যাব না। আমার বাবার দিব্যি—।

সে দুই হাতে হাঁসুয়াটা তুলে ধরল।

—এই হেঁসুয়া ছুঁয়ে বলছি। আমি লড়বো।

ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশ প্রসঙ্গে কিছু কথা

সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে এ যাবত বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মান ও বিষয়বস্তুর উন্নতির পর্যালোচনার ভিত্তিতে সম্ভাব্য কার্যকরী শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আশু ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী নির্ণয়ের জন্য এবং জন শিক্ষা প্রসারের কাজকে কার্যকরী করার জন্য ড. অশোক মিত্রের নেতৃত্বাধীনে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশনে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদরা সদস্য নিযুক্ত হন।

লক্ষ করার বিষয় এই কমিশনে একমাত্র অধ্যাপক মুনতাসা বিন কাসিম ব্যতীত কোন জন-প্রতিনিধি সদস্য নাই। এমন কি গণসাক্ষরতার কথা বলা হয়েছে অথচ নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বা কৃষাণ সভা বা কোন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি এই শিক্ষা কমিশনে সদস্য নাই। শিক্ষা ব্যাপারটি যারা পেশাগত ভাবে শিক্ষক তাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আবার এও ধরে নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকার কার্যত স্বীকৃত, তাই ভুলে বাগ্দী, সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তাঁরাই করতে পারেন। কমিশনের গঠন চরিত্রে এরূপই মনে হয়। একদা শিক্ষক মহাশয়রা মনে করতেন যে কোন ব্যক্তি গ্রাজুয়েট না হলে মাধ্যমিক স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হওয়ার উপযুক্ত নন এবং সেভাবেই ম্যানেজিং কমিটির গঠনবিধি করা হয়েছিল। পরে প্রতিবাদ হলে পরিবর্তন করা হয়। কমিশনের গঠন সম্বন্ধে প্রথমেই এই কথা বলার কারণ এই যে প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা প্রসার সম্বন্ধে কমিশনের বক্তব্য খুবই দুর্বল বা ভাসাভাসা।

কমিশন প্রথমে তুলে ধরেছেন ১৯৭৭ সালে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কার্যক্রম চালু করা হয় তার নেতিবাচক দিকগুলি। ১৯৭৭-এর পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অরাজক অবস্থা দেখা গিয়েছিল—স্কুলে, কলেজে পরীক্ষার হলে যে বিশৃংখল অবস্থা দেখা দিয়েছিল, পরীক্ষা নেওয়া এবং সময়মত ফল বের না হওয়া ইত্যাদির সমস্যা সম্বন্ধে—কমিশন দেখিয়েছেন যে অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন, পরীক্ষার হলে গণ টোকাটুকির অবসান না হলেও অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। নিয়মিত পরীক্ষা নেওয়া ও ফল বের করার ব্যাপারে অনেক উন্নতি হয়েছে। অপরদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজস্বর ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা ২৫ ভাগ বাজেট বরাদ্দ এখন শিক্ষাক্ষেত্রে হয়। আবার শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের ব্যাপারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কমিশন সংখ্যাতত্ত্বের মারফৎ উপরের ইতিবাচক দিকগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এখন দেখা দরকার নেতিবাচক দিকগুলি সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে কিনা এবং সে সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ কতখানি কার্যকরী হতে পারে। আমরা প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব।

প্রাথমিক শিক্ষা

কমিশন দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাখাতে দশগুণ ব্যয় বৃদ্ধি করেছেন। ১০০০ কোটি টাকা এখন প্রাথমিক শিক্ষায় বাৎসরিক খরচ। কিন্তু কমিশন দেখাননি যে এই দশগুণ খরচা বাড়িয়ে কম কতদূর এগোলো। স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে, ছাত্রের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু আগের ১০০ টাকা খরচে যে ছাত্র যে শিক্ষা পেত আজকে ১০০০ টাকার বিনিময়ে তার চেয়ে কত বেশি ছাত্র গুণগত ভাবে কত বেশি শিক্ষা পাচ্ছে তার কোন হিসাব কমিশন দেননি। অন্যদিকে কমিশন দেখিয়েছেন যে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছেন অথচ স্কুলের বাড়ি নাই বা ঘর নাই বা ঘর থাকলে তা উপযুক্ত নয়। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক নিয়োগ হলেন না। অথচ শিক্ষকদের নিয়োগ হয়ে গেল এবং বেতন বৃদ্ধি হতে লাগল।

১৯২৬ সালে তদানীন্তন বেঙ্গল কাউন্সিলের শেষ অধিবেশনে

রজবউদ্দিন তরফদারের প্রস্তাবে কাউন্সিল বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সুপারিশ করেছিল। তখনকার পাঠশালার পণ্ডিতরা জেলা বোর্ড মারফত মাসিক ৪ (চার) টাকা বেতন পেতেন। পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী বেতন ছিল ১৪ টাকা ও হেড মাস্টারের জন্য ১৬ টাকা। এই শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাথমিক ছাত্ররা অঙ্ক, বাংলা সাহিত্য এবং হাতের লেখা, কিছু ইতিহাস ও ভূগোল পড়ে আসতেন। মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁরা খুব কম যেতেন না। পরবর্তীতে এই ছেলেদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ভাল ফল করে গেছেন।

আজকের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি বালককে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সেই ৪ টাকা বা ১৪ টাকার বেতনের গুরুমশাইদের ছাত্রদের ধারে কাছেও কেউ যাবে না যদি না ছাত্রদের বাবা মা নিজেরা শিক্ষা দেয় বা প্রাইভেট ভাবে অন্য ব্যবস্থা করে দেয়। আমাদের বক্তব্য এই যে কমিশন সরকার কর্তৃক ব্যয়ের অঙ্ক যেমন দেখিয়েছেন তেমনই ভাবে যদি গুণগত বিচার করে বলতে পারতেন যে এই টাকা খরচের দ্বারা শিক্ষার মান বাড়ান হয়েছে তাহলে ভাল হত। কিন্তু কমিশন সে পথেই হাঁটেননি। এখন একটা প্রশ্ন সামনে আসে—গ্রামের একটা লোক চোর বা ডাকাত হলে বা নারীঘটিত অপরাধে অপরাধী হলে সকলেই তাকে সমাজ বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করে—অনেক সময় এমন ব্যবস্থা করেন যে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এবার আমার জিজ্ঞাসা—যে প্রাথমিক শিক্ষক দিনের পর দিন কামাই করেন অথবা সপ্তাহে ২।১ দিন দয়া করে আসেন এবং সই করে চলে যান তিনি বেশি সমাজবিরোধী না ঐ ডাকাত বা বদমাশ বেশি সমাজবিরোধী? সরকারের কাছ থেকে হারামের পয়সা খেয়ে সমাজে এরা গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসাবেই বিরাজ করে। কমিশনের রিপোর্ট থেকেই দেখা যাবে যে এই ধরনের ব্যাপারটি, যাকে এবসেনটিজম বলা হয়, কত ব্যাপক। মাধ্যমিক শিক্ষক অপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষকদের এই ব্যাধি ব্যাপকতর।

শিক্ষার প্রসার না শিক্ষক কল্যাণ

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে ১৯৭৭ সালের পর যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে কমিশনের কয়েকটি মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ:—

(১) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় দশগুণ বাড়িয়ে সেই টাকার ৯৫ শতাংশ দিয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও নতুন বেতন হার চালু করা হয়েছে।

(২) কিন্তু দেখা গেল, যে স্কুল অনুমোদনের নামে শিক্ষক নিয়োগ করা হল বহুক্ষেত্রেই তার উপযোগী অন্যান্য ব্যবস্থা যেমন পাঠগৃহ, চেয়ার টেবিল ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি কিছুই নেই। এই অভাবকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার-এর অভাব বলেছেন।

(৩) এর পর যে সব স্কুলের গৃহ আছে আসবাবও কিছু আছে সেখানে স্কুল অনুমোদিত হল, শিক্ষক নিযুক্ত হলেন, কিন্তু এর উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রইল না। কমিশন এই ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করেছেন। কার্যত এবসেনটিজম্ বা কাজে ফাঁকির অন্যতম কারণ হচ্ছে এই নিয়ন্ত্রণহীন অনুমোদন নিয়োগ বা অপনিয়োগ। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বাদ দিলেও সমাজতন্ত্রের কোথাও কি এরূপ বহ্বাহীন কর্ম-ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে? এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে বামফ্রন্টের প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা আসলে শিক্ষা প্রসারের নামে বেকার উদ্ধার। প্রকৃতপক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই ১০ গুণ টাকা খরচ করে নামে শতকরা ৮০টি স্কুল বৃদ্ধি করে শিক্ষার প্রসার কিছু হলেও গুণগতমান অতি নিম্নে। প্রাইমারি শিক্ষা শেষ করে যে ছাত্রটি হাইস্কুলে ভর্তি হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় বৎসর বৎসর তার মান নেমে যাচ্ছে। এখানে অবশ্য বলা দরকার যে স্বাধীনতার পর, ১৯৭৭ সালের আগে, যে-পরিকল্পনা চালু ছিল সেখানেও মূলতঃ উপরোক্ত শিক্ষকনিয়োগ চিন্তাই প্রবল ছিল। ১৯৪৭ সালের পর প্রদেশ স্তরের কংগ্রেস নেতারাও মনে করছিলেন যে এই প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ করে তাদের মারফৎ গ্রামীণ সংগঠন গড়বেন। এই কথাগুলো আমি কোন সমালোচনার জন্য বলছি না। বামফ্রন্টের আমলে কথাটা আংশিক ভাবে সত্য কারণ কৃষক আন্দোলনের মারফৎ তার নিজস্ব গ্রামীণ ভিত্তি আগের থেকেই ছিল।

কমিশনের সুপারিশ

শিক্ষা কমিশন বাস্তব অবস্থার মোকাবেলায় কয়েকটি সুপারিশ করেছেন যেমন—

(১) শিক্ষকদের বেতনের খরচাদি বাৎসরিক হিসাবে মোট ব্যয় ৯৫ শতাংশের বদলে ৭৫ অংশে নির্ধারিত করতে হবে। এটা যেহেতু বেতন কমিয়ে ৯৫ থেকে ৭৫ শতাংশ

করা যাবে না তাই কমিশন সুপারিশ করেছেন শিক্ষাসেস্ বা শিক্ষাকর বসিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়কে বাড়াতে হবে এবং সেই বর্ধিত ব্যয়ের ৭৫ অংশ শিক্ষককে দিতে হবে অর্থাৎ তাঁকে ৯৫-এর বদলে ৭৫ টাকা দেওয়া যাবে না খরচের অঙ্কটা বাড়িয়ে প্রাপ্যকে ৭৫ শতাংশ করতে হবে, যাতে শিক্ষকদের বেতন আগের মতই থাকে ?

(২) কমিশনের দ্বিতীয় প্রস্তাব ঐ শিক্ষাসেস বসিয়ে পরিদর্শকের সংখ্যা বাড়ানো হোক।

(৩) গ্রামে গ্রামে প্রতি প্রাথমিক স্কুলের জন্য একটি করে গ্রামীণ কমিটি করে স্কুলগুলির তদারকির ব্যবস্থা করা হোক।

এই তিন প্রস্তাবের মধ্যে শেষেরটি আপাতদৃষ্টিতে বেশ আকর্ষণীয়, কিন্তু বাস্তবে এটি ফাঁকা বুলিমাত্র। কারণ এই ধরনের কমিটির কোন ক্ষমতার কথা বলা হয়নি, কোন আইন অনুযায়ী কী ধরনের নির্দেশ তাঁরা দিতে পারেন সেকথাও কিছু বলা হয়নি। যারা নিয়মিত স্কুল করে না, তাদের শাস্তি বিধানের কোন ব্যবস্থা সুপারিশে নেই। অবশ্য একথা সত্য যে জনসাধারণকে শিক্ষা পরিচালনায় সামিল করতে হবে। এই সামিল করার পদ্ধতি ও কার্যক্রম আলাদা ভাবেই চিন্তা করা দরকার।

শিক্ষা প্রসারের নামে যাদের কর্মে নিয়োগ করা হয়েছে তাদেরকে প্রকৃত শিক্ষকে পরিণত করার জন্য কমিশন এক-মাসের ট্রেনিংএর ব্যবস্থার কথা বলেছেন। সেটা কার্যকরী ব্যবস্থা হবে বলে হয় না। একদিকে তাদের সমাজ সচেতন কর্মী হিসাবে গড়ে তোলা অন্যদিকে পেশাগত ভাবে শিক্ষকে পরিণত করা—এই দুইটি কাজ কঠিন, কিন্তু এটি না করে কোন অর্থব্যয় মারফৎ প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষার উন্নতি করা সম্ভব হবে না। অপরাধ শুধু শিক্ষকের নয়, প্রশাসন এবং সমাজেরও এই দায়িত্ব পালনে গাফিলতি হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করা হলে নিশ্চয়ই শিক্ষার মান উন্নতি হতে পারে। তবে কমিশন এক্ষেত্রেও দুটো দিক বিবেচনা করেননি। প্রথম কথা, শিক্ষার উদ্দেশ্যে কী ? দ্বিতীয়তঃ, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারি সহযোগিতা কী ধরনের হওয়া উচিত। প্রথমিক শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। অভিভাবকেরা যখন একটি ছেলেকে প্রাথমিক স্কুলে পাঠান তখন প্রধানতঃ উদ্দেশ্য থাকে ছেলে যাতে একটু লেখাপড়া করে অন্তত চিঠিপত্র, হিসাব নিকাশ করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষার জন্য সাধারণ গরিব মা-বাবা রাখাল বাগাল না করে স্কুলে পাঠাবার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য কতটা সফল হয় সেকথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলে যখন পাঠান হয় তখন সেকালের ভাষায় কেরানি সৃষ্টি বা এখনকার ভাষায় 'চাকুরি পাওয়ার' সুযোগের জন্য স্কুলে পাঠান হয় ছেলে-মেয়েদের। মেয়েদের ব্যাপারে অবশ্য আর একটি অন্যরকম ধারণাও বর্তমান। কারণ লেখাপড়া না শিখলে ভালভাবে পাত্রস্থ করা যাবে না। একদিকে শিক্ষার পরিণতিতে জীবনে করে খাবার ব্যবস্থা হবে না এটাও যেমন অবাস্তব পরিকল্পনা, অন্যদিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরি পাওয়া হলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ অপেক্ষা পরীক্ষার সার্টিফিকেটটাই গুরুত্বপূর্ণ হতে বাধ্য। অর্থাৎ সেখানে পাশ করাই সত্য, শিক্ষার কোন দাম নেই। এই ব্যবস্থাতে কি প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে ? দ্বিতীয়তঃ মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারি অনুদানের নামে যদি শুধু শিক্ষকদের বেতন বাড়ান হয় এবং শিক্ষক নিয়োগ করে নতুন নতুন স্কুল করা হয় তাহলে কি শিক্ষার মান বাড়তে পারে ? শিক্ষক কর্মীরা এ কথার প্রতিবাদ করতে পারেন কিন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল হঠাৎ উঠিয়ে দেওয়া হল কেন এবং শিক্ষকদের সমগ্র বেতনভার সরকার নিয়ে নিলেন কেন ? অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলে কি লেখাপড়া হচ্ছিল না ? কমিশন যখন সেটা বিচার করছেন তখন তাঁরা কী দেখলেন ? সমগ্র বেতনের দায়িত্ব নেওয়ায় এবং অনেক স্কুলকে অনুমোদন দেওয়ায় কি শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে ? দুঃখের বিষয় কমিশন সেদিক দিয়ে কোন আলোচনায় যাননি। আলোচনা করলে দেখতে পেতেন আগের দিনের সরকারি যে সব স্কুলের ভাল লেখাপড়া হয় বলে নাম ছিল সেসব স্কুলের নামও তলিয়ে গেছে। এমনকি কয়েক বছর আগে হিন্দু স্কুলের নাম ছিল কিন্তু সে স্কুলও এখন পিছিয়ে পড়েছে। বালিগঞ্জ, হেয়ার এসব স্কুলের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল। অন্যদিকে যেসব প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকরা ছেলে তৈরি করার জন্য ব্যগ্র থাকতেন, নিজের অতিরিক্ত সময় দিয়ে স্কুলের ও ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল উন্নত করতেন সরকার তাদের বর্ধিত বেতন নির্দিষ্ট এবং নিশ্চিত করে দিয়ে ভাল শিক্ষকের

উদ্যোগ নষ্ট করে দিয়েছেন। পরীক্ষার ফল যাই হোক না কেন, একটি স্কুলের খাতায় ২৫০ ছেলের নাম থাকলে তার অনুমোদন কাটার কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং স্কুলের ছেলে বাড়ানোর তাগিদও শিক্ষকদের কমে গেছে। যে সব স্কুলের পরীক্ষার ফল ভাল তাদের প্রতি কমিশন উল্টো কটাক্ষ করে বলেছেন এরা সব পত্রিকার বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মারফৎ নিজেদের জাহির করেন। যখন শিক্ষক আন্দোলনের কোন নেতাকে বলা যায় যে নরেন্দ্রপুর, রহড়া কি পুরুলিয়া তিন স্থানের ফলাফল ভাল হয় কী করে যদি না সেখানকার শিক্ষণপদ্ধতি ভাল থাকে ? এর জবাবে শিক্ষক নেতারা বলেন, তারা বাছাই করে ছেলে নেন ইত্যাদি। কমিশন আর একটি দিকও বিচার করেননি, ইংরেজি মাধ্যমেই ছেলেকে পড়তে পাঠানোর অন্যতম কারণ হচ্ছে যে আমাদের সরকারি সাহায্যপুষ্ট স্কুলগুলি অতি নিম্নস্তরে চলে গেছে। ইংরেজি মিডিয়ামে যেসব ছেলেমেয়েরা পড়েন তারা অনেক-ক্ষেত্রে বাংলাতেও অনেক ভাল করেন। মূলতঃ ইংরেজির প্রতি আসক্তির জন্য নয়, আসলে, পড়াশুনাটাই ভাল হবে এই ধারণা নিয়ে মা-বাপেরা ইংলিশ মিডিয়ামে তাদের ছেলেকে ভর্তি করান। বাংলা মিডিয়াম যদি সেরকম ভাবে গড়ে তুলতে পারত এবং ইংরেজি শিক্ষাটা উচ্চমানে আনতে পারত তাহলে মা-বাবা বাংলা মিডিয়াম স্কুল ছেড়ে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়াতে দিতে ব্যস্ত হতেন না। এসব কথা ছেড়ে দিলেও কমিশন শিক্ষার মান নেমে যাওয়ার কথাটি অস্বীকার করেন নি অথচ এব্যাপারে কতদূর কী করা যায় সেদিকে দৃষ্টি দেননি। বর্তমানে যে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নিয়ম আছে তার দ্বারা কার্যতঃ ম্যানেজিং কমিটিকে অস্তিত্বহীন করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিঞ্চিত আর্থিক উপায়ের ব্যবহার প্রথা চালু হয়েছে। এরই ফলে শিক্ষাবিভাগ অসংখ্য মামলায় জড়িত হয়েছেন এবং দুর্নীতি প্রবেশ করেছে। ম্যানেজিং কমিটিগুলিকে কী ভাবে স্থানীয় জনসাধারণের আস্থাভাজন করা যায় এবং তাদের তদারকি ক্ষমতাটা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। বর্তমান নিয়মে চারজন শিক্ষক প্রতিনিধি এবং প্রধান শিক্ষক বা সম্পাদক মহাশয় একদিকে হলে কার্যত কারও ক্ষমতা নেই যে তাঁদের দুর্নীতি ঠেকাতে পারে। আবার প্রধান শিক্ষক যদি সময়মত নির্বাচন না করেন তবে হাইকোর্টের নির্দেশ-ছাড়া তাঁকে দিয়ে ম্যানেজিং কমিটির সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও নির্বাচন করান যায় না। এই ম্যানেজিং কমিটি সম্বন্ধে কমিশন একেবারেই চিন্তা করেননি, শুধুমাত্র আমলা-দের উপর নির্ভরশীল হলেন, এটা বোধ হয় ঠিক হল না।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার শেষ দিকে অথবা জুনিয়র হাইস্কুলের পরেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা আলোচনা করা দরকার। এ বিষয়ে কমিশনের শর্তগুলি আরও একটু বেশি কার্যকরী হওয়া উচিত ছিল। গ্রামাঞ্চলে একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার পর স্থানীয়ভাবে কর্মনিযুক্তির সুযোগ বেড়েছে। এরজন্য মোটরগাড়ি চালনা ও মেরামতি শিক্ষা, ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও মেরামতি শিক্ষা, বিদ্যুতের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি শিক্ষা, মাধ্যমিক পাশ করে অথবা জুনিয়ার হাই পাশ করে এগুলো শেখান এবং তার সঙ্গে যদি ইংরেজি ও বাংলায় মোটামুটি দখল এবং সাধারণ অঙ্কের জ্ঞানটা বাড়ান যায় তাহলে এইসব ছেলেরা অনেক দিক থেকে কর্মক্ষম হবে এবং স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। কাজেই বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পাঠক্রম তৈরি করলে এবং সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করলে আমরা অনেক বেশি ফললাভ করতে পারি।

সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে আর একটি দিক বিবেচনা করা দরকার। অনুমোদন (এ্যাপ্রুভাল), নথিভুক্তকরণ, স্বীকৃতি (রিকগনিশন) ইত্যাদি শব্দ কমিশন ব্যবহার করেছেন এবং বিষয়টি আয় বাড়াবার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন ফি বছর বছর আদায় করার কথা বলা হয়েছে।

আগে যে-ব্যবস্থা চালু ছিল তাকে বলা হত university affiliation (বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্তিকরণ)। কতকগুলি নিয়মকানুন নির্দিষ্ট ছিল। সেই নিয়মের নিরিখে ইউনিভার্সিটি এ্যাফিলিয়েশন দিত। যুক্তফ্রন্টের আমলে এই এ্যাফিলিয়ে-শন বন্ধ করে দেওয়া হল। বলা হল, রেজিস্ট্রেশন বা অনুমোদনও স্বীকৃতির সঙ্গে স্কুল শিক্ষকের বেতন সরকার থেকে দেওয়া হবে। নতুন স্বীকৃতি বাবদ সরকারের ব্যয় বেড়ে গেল এবং এ্যাফিলিয়েশন ব্যাপারটি কার্যতঃ শিক্ষা বিভাগের হাত থেকে অর্থ দপ্তরের হাতে গেল। এখন নতুন স্কুলকে অনুমোদন দিতে গেলে আগে অর্থ দপ্তরের অনুমতি বা সম্মতি নিতে হয়। এর ফলে স্কুলগুলিকে বছরের পর বছর অনুমোদনের আশায় বসে থাকতে হয় এবং নানারকম কারচুপি করে অনুমোদিত স্কুল মারফৎ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় বসবার সুযোগ করে দিতে হয়। যদি উপযুক্ত শিক্ষক

থাকেন এবং ছাত্র থাকেন এবং বিল্ডিংস থাকে তাহলে পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাবার ব্যবস্থা বা এ্যাফিলিয়েশন দেওয়া হবে না কেন? শিক্ষকদের বেতন নিশ্চিত করা—কার্যতঃ তার জন্য ভর্তুকি ব্যবস্থাও থাকতে পারে, কিন্তু মাধ্যমিক স্কুলের ফি মারফৎ টাকা তোলা হবে না কেন? প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট অনুদান মারফৎ টাকায় শিক্ষার প্রসার হবে না কেন? এইগুলি বিচার করে দেখা দরকার। কারণ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থা সঙ্গিন হওয়ায় তারা নতুন স্কুলগুলির স্বীকৃতি দিতে পারছে না। ১৬/১৭ বছর ধরে স্কুল চালাচ্ছেন অথচ স্কুল রিকগনিশন বা এ্যাফিলিয়েশন কিছুই পাচ্ছে না। এই অবস্থার পরিবর্তন করা উচিত। কমিশন বলেছেন যে তাঁদের তদন্তে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের অনুপস্থিতির সেরকম সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। হতে পারে প্রাথমিক অপেক্ষা মাধ্যমিকে উপস্থিতির হার ভাল। কিন্তু গ্রামের মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় মাধ্যমিকেও অনুপস্থিতির ঘটনা কম নয়। ম্যানেজিং কমিটির সংগঠন এমন যে, চারজন শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক এক দল হলে গুরুতর অপরাধী শিক্ষককও বেমালুম খালাস পেয়ে যান।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কমিশন ঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে এই দু জায়গাতেই শিক্ষা পরীক্ষা-সর্বস্ব। কমপক্ষে গ্রাজুয়েট না হলে কাজ পাওয়া যাবে না, তার জন্যে বেশির ভাগ ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য অগ্রসর হন এবং গ্রাজুয়েট হবার পর কাজের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত পড়াশুনা চালানো ভাল—সেইজন্য এম. এ. পড়েন। আমাদের কলেজ শিক্ষার প্রসার হয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে আটটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩১২টি কলেজ হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান যে খুব উন্নত হচ্ছে না কমিশন সেকথাও বলেছেন। 'পে-প্যাকেট' পদ্ধতি চালু হবার পর গভঃ কলেজ, স্পনসর্ড কলেজ ও বেসরকারি কলেজ কার্যতঃ এক হয়ে গেছে। কমিশন নিজেই বলেছে নামকরা পুরাতন প্রাইভেট কলেজগুলি তাদের সুনাম হারিয়ে ফেলেছে। কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে পঠন-পাঠনের জন্য এমনকি সাধারণ ভাবে ক্লাস নেবার আগ্রহও কম। অন্যদিকে ছাত্রদের সম্পর্কে তাঁরা বলেন যে তারা আর পূর্বের মত শিক্ষানুরাগী নয়। দু পক্ষের কথার মধ্যে সত্যতা আছে, কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে কমিশন বিশেষ কিছু বলেননি। অন্যদিকে শিক্ষা বিভাগের কার্যকরী নীতি হল 'পে-প্যাকেট' বা বেতন নিশ্চিত করা। শিক্ষার উন্নতি যেন অধ্যাপকদের বেতন ও সুখ সুবিধার উপরই নির্ভর করে। সমগ্রভাবে কমিশন এই অবস্থার কোন পরিবর্তনের কথা বলেন নি। অন্যদিকে আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হয়ে এখন কলেজ ফি এবং বিভিন্ন আনুষঙ্গিক ফিজ বাড়াবার প্রস্তাব দিয়েছেন। স্বভাবতই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে। বিগত ১৫/১৬ বছর ধরে অবৈজ্ঞানিক শিক্ষার যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তাকে আজকে পাল্টাতে হলে বা পরিবর্তন করতে হলে সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা দরকার। এতদিন কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা বিনা-বেতনে বা নামমাত্র বেতনে দান করা হচ্ছিল। শ্রেণিবদ্ধ সমাজে যেখানে শিক্ষার সুযোগ স্বভাবতই ওপরতলায় লোকেরা আগে নেবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের মোটা অংশটা তাদের পকেটেই যাবে সেখানে এই ধরনের ব্যবস্থা কতদূর সমীচীন ছিল তা পর্যালোচনা করা দরকার। কিন্তু সে আলোচনা না করেই কমিশন শিক্ষা খরচ থেকে শুরু করে উচ্চহারে ফি পরিবর্তন করার নীতি গ্রহণ করেছেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে একটি মাদ্রাসা বোর্ড আছে কিন্তু এটি কোন আইনদ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠান নয়। অথচ হাইকোর্ট বারবার এই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। কমিশনের রিপোর্ট থেকে মনে হয় যে শিক্ষা বিভাগ কমিশনকে এই ব্যাপারে কোন কিছু অবহিত করেন নি।

পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ড গঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। এটি সরকারি একটি নির্দেশনামা—যার নোটিফিকেশন নম্বর হল Edn (M)/5-572 dated 2nd Feb, 1973। এই নোটিফিকেশনটি কলকাতা হাইকোর্ট অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন কারণ এটি কোন আইনের দ্বারা সমর্থিত নয় বা কোন আইনানুসারে নোটিফিকেশন হয়নি। অথচ এই বোর্ড মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমিক পর্যন্ত স্তরটি পরিচালনা করেন। কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তাও ঠিক নয়। কলকাতা মাদ্রাসা গঠিত হয় ১৭৮০ সালে হেস্টিংস কর্তৃক। এখানে প্রথমে প্রধানতঃ ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, ইসলামিক আইন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, কাব্য ইত্যাদি পঠনপাঠন শুরু হয়। ১৯২৫ সালে 'নিউ স্কীম' মাদ্রাসা চালু হয়। এই ব্যবস্থা ক্রমে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ মাধ্যমিক বিষয়গুচ্ছির অনুগামী কোর্সে পরিণত হয়। কেবলমাত্র একশত নম্বর আরবি শিক্ষা ও একশত নম্বর ইসলামিক শিক্ষা অতিরিক্ত পড়তে

এবং পরীক্ষাদি দিতে হয়। কমিশন ধরে নিয়েছেন হাই মাদ্রাসার পর সিনিয়র মাদ্রাসা পড়ার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব নিউ স্কীম হাই মাদ্রাসার পর হায়ার সেকেণ্ডারি বা উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা। পাশাপাশি অন্য যে পড়ার ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ 'ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা' যেখানে প্রাথমিক থেকে আলিম, কাজিল ও মুমতাজউল মুহাদ্দেসিন (এম. এ) পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে। কমিশনের ধারণা যে এটি মাত্র কোন উপরের দিকে পড়ার ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। 'ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা'য় গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট পঠন পাঠন সম্ভব। বর্তমানে পুরোন স্কীমেও কিছু কিছু বিষয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এই পুরোন স্কীম মাদ্রাসায় প্রধানতঃ ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব, ইসলামিক আইন, ইতিহাস ইত্যাদি পড়ানো হয়। ওল্ড স্কীম শিক্ষা সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা দরকার এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাও নতুন করে ভাবা দরকার।

এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর বিতর্কের অবকাশ আছে যার অন্তত্ব পূর্ণ আলোচনা দরকার। মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করে সুনির্দিষ্ট আইন করা উচিত। অন্যদিকে বহু গ্রামে মক্তব মাদ্রাসা চালু আছে। কার্যতঃ এখানে বাড়ির কৃষক সন্তানেরা পড়তে যায়। অবস্থাপন্ন মুসলমানেরা এইসব মক্তব-মাদ্রাসায় তাদের ছোটদের বিশেষ একটা পাঠান না। যারা এখানে পড়ে বা মাঝপথে পড়া ছেড়ে আসে তাদের মধ্যে বেকারও প্রচুর। লেখাপড়া শিখতে গিয়ে কৃষকের ছেলে চাষের কাজ ভুলে যায়। অন্যদিকে পাঠ সম্পাদন করার পর তার জীবিকা অর্জনের কোন ব্যবস্থা থাকে না। আমাদের দেশে একটা প্রথা চালু আছে যে গরিব কৃষকের গ্রামে মসজিদের ইমাম হলে তাকে ৩০ দিনে ৩০ বাড়ি খেতে হবে। বড়লোকের গ্রামে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ভাল হয়। কিন্তু তার সামনে মোতোয়াল্লি মসজিদের জমির ধান মেরে খায় সে কিছুই বলতে পারে না।

সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে পড়াশুনা ছাড়া ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠার বিষয়েও আলোচনা করা দরকার।

ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যম

কমিশন দুইদিক থেকেই বিষয়টি আলোচনা করেছেন। সাধারণভাবে কোন শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানো হবে এ বিষয়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে—তেমনি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল শিক্ষার (প্রাইমারী ও মাধ্যমিক) আলোচনা করেছেন। প্রথম আলোচনায় কমিশন বলেছেন যে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা পড়ানর বিপক্ষেই অধিকাংশ-এর মত। এ ব্যাপারে কোঠারী কমিশন, মুদালিয়র কমিশনের মত তাঁরা উদ্ধৃত করেছেন। দেখানো হয়েছে ভারতবর্ষে মুখ্যরাজ্যগুলির মধ্যে এক তামিলনাড়ু ছাড়া কোথাও প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ান হয় না। এছাড়া নাগাল্যাণ্ড, সিকিম, মণিপুর, ত্রিপুরাতে কোথাও শুরু থেকে কোথাও প্রথম থেকে কোথাও তৃতীয় বা চতুর্থ থেকে ইংরেজি বাধ্যতামূলক হিসাবে চালু আছে। তাছাড়া অধিকাংশ রাজ্যে পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষা চালু আছে। কোঠারী কমিশনের নির্দিষ্ট মত এই যে পঞ্চম শ্রেণীর আগে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়। তাঁদের প্রধান যুক্তি এই যে বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক স্কুলে ইংরেজি পড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অবস্থার সিদ্ধান্ত নেন যে ষষ্ঠ ক্লাস থেকে ইংরেজি পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে, তার নিচে নয়। এ ব্যাপারে প্রবল বিরোধিতা এসেছে—সেসব যুক্তিতর্কের এখানে পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। মিত্র কমিশন বাস্তব অবস্থা মেনে নিয়ে পঞ্চম স্তর থেকে ইংরেজি চালু করার সুপারিশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে বাদ দেওয়ার কারণ কিছু ওরা বলেননি তবে এ ব্যাপারে কোঠারী কমিশনের যুক্তিটা অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পূরণের জন্য দুটি ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। সেকেণ্ডারি বোর্ড 'লারনিং ইংলিশ' এই সিরিজের যে বইগুলো বের করেছেন তারই ভিত্তিতে ব্যাপক প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং বা শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে এবং 'লারনিং ইংলিশ' সিরিজটিকে বাংলায় তর্জমা করতেও বলা হয়েছে। একথা সত্যি আগে শিক্ষকরা যদি নিজেরা নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বা অভ্যস্ত না হন তাহলে তাঁরা ছাত্রদের শেখাবেন কী করে? কাশেনাল এবং কমিউনিকেটিভ মেথড অর্থাৎ নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে ৬ বছরে ছাত্ররা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারবে এটাই বোর্ডের ধারণা। এই ধারণাকে মেনে নিয়ে এবং কোঠারী কমিশনের সুপারিশ মেনে ডঃ মিত্র কমিশন পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি চালু করার কথা বলেছেন। এইখানেই আস্থার অভাব রয়েছে। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব অনুযায়ী ৬ বছরে

ইংরেজি আয়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে না এবং সরকারি সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুল থেকে যে ছাত্র বেরিয়ে আসছে তাদের মান অত্যন্ত নিম্নগামী। ইংরেজিতে তারা কোন প্রশ্নোত্তর করতে পারে না। আর যারা পারে দেখা যাবে, তারা বাড়িতে অভিভাবকদের কাছেই হোক অথবা গৃহশিক্ষক-এর কাছ থেকে আলাদাভাবে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করে নেয়। গ্রামবাংলার স্কুল থেকে যে সব ভাল ফল করা ছাত্র বেরিয়ে আসে তাদের অধিকাংশই তুলনামূলকভাবে অবস্থাপন্ন ঘরের বা শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। মিত্র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিপুল সংখ্যক শিক্ষককে নতুন পদ্ধতিতে ইংরেজি পড়ানোর শিক্ষা দেওয়া যাবে—কতদিনের মধ্যে, তা বড়ই অনিশ্চিত। তৃতীয় শ্রেণী থেকে পড়াবার অনুমতি গ্রামাঞ্চলে দিলে তা খুব ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না, তবে শহরাঞ্চলে বা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ অঞ্চলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করার অসুবিধা কিসের? এই প্রসঙ্গে যে যুক্তিটা দেখানো হয়েছে যে এরকম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলে দুকরম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় দুরকম কেন আমাদের অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী দশরকম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। গ্রামাঞ্চলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের তৃতীয় কেন প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ঘরে বসেই ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করেন। কমিশন এই বাস্তব অবস্থা জেনেও চোখ বুজে তা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন। এর থেকেই ব্যাঙের ছাতার মত ইংরেজি শিক্ষার প্রবণতা বেড়েছে আর ছেলেমেয়েদেরকে বাংলা ছড়াছবির বদলে 'হামটি-ডামটি-বাবা ব্ল্যাকশিপ' শেখাবার আগ্রহ বেড়েছে। যার বাবা বা ঠাকুরদাদা মাদুর পেতে লণ্ঠনের আলোয় লেখাপড়া শিখেছে এবং ভালই শিখেছে—এখন তাঁরা সোফা-সেটিতে বসছেন, কাজেই 'হামটি-ডামটি' না শেখালে চলবে কেন?

অন্যদিকে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চালানো হয় তাতে এই জিনিসটা অস্বীকার করার চেষ্টা করা হয় যে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে ভাল লেখাপড়া হচ্ছে না বলে এই প্রবণতা তীব্রতা পেয়েছে, অথচ এখনও দেখা যাবে যে নানারকম পরীক্ষায় এমনকি বিদেশেও যারা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকে তাদের মধ্যে বাংলা মাধ্যমের ছেলেদের সংখ্যা বেশি। অধিকাংশ নাম করা ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে যে সব ছাত্ররা বেরিয়ে আসে তারা কথা বার্তায় খুব চালু হয়। নানান ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিজেদের কাজকর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু উচ্চতর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে তারা ফল ভাল করে তা ঠিক নয়। কিন্তু বাংলা মাধ্যম মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলির মান ক্রমশই নিচের দিকে চলে যাচ্ছে। ম্যানেজিং কমিটি দুর্বল হয়ে গেছে এবং শিক্ষকরা নানাভাবে কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নচেৎ সাধারণ মধ্যবিত্ত ১৫০/২০০ টাকা বেতন দিয়ে ছেলে-মেয়েদের ইংরেজি স্কুলে পড়াবার জন্য ব্যস্ত হত না, তাছাড়া অভিভাবকগণ জানেন ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার জন্য ইংরেজি আমাদের পড়তে/জানতে হবেই। বাস্তব অবস্থায় ইংরেজিই আমাদের সর্বভারতীয় ভাষা। কেন্দ্র থেকে হিন্দীকে যতই চালু করার চেষ্টা করা হোক, শুধু সারা ভারতে কেন, বাংলা দেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত ইংরেজি সাধারণ-ভাবে প্রচলিত ভাষা। এই ভাষাকে আয়ত্ত করা বা এর মাধ্যমে পড়ানোর চেষ্টাকে ঔপনিবেশিক চিন্তা ও মনো-বৃত্তির প্রভাব বলে অভিভাবকদের গালি গালাজ করে লাভ নেই। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর অনুগামীরা কিছুদিন আগে পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করে দিয়েছেন যারা ছেলেদের ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া শেখাতে চান তাঁরা ঐ ঔপ-নিবেশিক মনোবৃত্তির দাস মাত্র। কিন্তু এঁরা চিন্তা করেন না যে বাংলা স্কুলের পঠন পাঠন এত নিম্নস্তরের, এমনকি বাংলা ভাষা শিক্ষাও এত নিম্নগামী যে অনেক পয়সা খরচ করে মধ্যবিত্ত বাড়ালি ছেলেমেয়েদের ভাল পঠন পাঠনের জন্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হন, সেখানে কোথাও কোথাও বাংলা ভাষাও অনেক ভাল শেখান হয়। এই অবস্থাকে সহজভাবে না মেনে নেওয়ার জন্য প্রাইভেট ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি রাজ্যের সেকেণ্ডারি বোর্ডের বাইরে গিয়ে কেন্দ্রীয় বোর্ডগুলির অনুমোদন নিতে বাধ্য হচ্ছেন। সেখানেও কেবলমাত্র শিক্ষা বিভাগের 'নো-অবজেকশান' বা আপত্তি নাই এই সার্টিফিকেটের জন্য নানা-রকম কৌশল ও দুর্নীতির ব্যবস্থা চলছে। যাই হোক বর্তমান অবস্থা আমাদের মেনে নিতেই হবে যে একাধিক প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে এবং বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তা চালু থাকবে। সর্বজনীন শিক্ষার নামে যদি সর্বস্তরে সমশিক্ষা দান ব্যবস্থার চেষ্টা করা হয় তাহলে কোন ফল হবে না। অন্যদিকে কমিশনের সঙ্গে আমরাও একমত যে ইংরেজি পঠন পাঠনের নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে পুরোন ব্যবস্থা বেশ কিছুকাল চালু রাখতে হবে। হঠাৎ করে নতুন ব্যবস্থা

চালু করতে গিয়ে ইংরেজি শিক্ষার বিপর্যয় ডেকে আনা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়

কার্যতঃ এখানেও বিনা পয়সায় পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে, যদিও মূলতঃ উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ছেলেরাই এখানে পড়েন। তাদের পয়সা দেবার সামর্থ্য আছে অথচ তারা কার্যতঃ বিনা বেতনে পড়েন। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে কিন্তু তার দ্বারা শিক্ষার মান খুব বেড়েছে বলে ধারণা করবার কোন কারণ নেই। এর সংগঠন দেখলে মনে হয় উচ্চ মধ্যবিত্তের এবং উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকদের চাকরি এবং সুখ-সুবিধাদির ব্যবস্থার জন্য এগুলি আছে। অভ্যন্তরীণ কলহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সে সব দিকে কমিশন নজর বিশেষ দেননি বলেই আমাদের মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পিছনে যে বিপুল খরচা আমরা করছি তার কোন প্রয়োজন আছে কি? অভিযোগ আছে, যারা স্টাইপেন্ড স্কলারশিপ এবং বিশেষ করে গবেষণাবৃত্তি পান তাদের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত গবেষণাপত্র জমা দেন না এবং যেসব গবেষণাপত্র জমা হয় সেগুলির বেশির ভাগেরই কোন উপযোগিতা নেই। কাজেই যেমন প্রাইমারিতে তেমনি ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান এবং তাদের অধিকতর কল্যাণ সাধনের ব্যবস্থারই প্রাধান্য। শিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষক-এর পরিচর্যাটাই মূল কথা। আশা করা হয়েছিল, স্বাধীনতার পর শিক্ষিত সম্প্রদায় নৈতিক দিক থেকে শিক্ষাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার বদলে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র এবং মুষ্টিমেয় কিছু পরিবারের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। উচ্চবর্ণের ভদ্রলোকরা শুধু যে এখানেও প্রাধান্য লাভ করছেন তাই নয় তাঁরা কী ভাবে অন্যদের দাবিয়ে রাখছেন তার বিশেষ দৃষ্টান্ত চুনী কোটালের ঘটনা। চুনী কোটালের আত্মহত্যা ব্যাপারটি সামনে এসেছে, কিন্তু এধরনের অবিচার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে বিদ্যমান। একদা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হত উত্তর প্রদেশের ১৫টি মুসলিম পরিবারের জমিদারি। পশ্চিম বঙ্গের আটটি বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখা যাবে এই ধরনের কিছু বেশি সংখ্যক পরিবারের আধিপত্য। এগুলিই তাঁদের কর্মক্ষেত্র বা অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র। কমিশন এই ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে গেছেন কেন জানিনা। তবে এর প্রতিকার সম্ভব বলে মনে হয় না।

সাক্ষরতা অভিযান

সাক্ষরতা অভিযান সম্পর্কে কমিশনের মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে কমিশন বলেছেন যে, বামফ্রন্টের দশ বছর কার্যতঃ কোন ফল দেয়নি। কেন্দ্রের গণশিক্ষার পরিকল্পনায় কিছু লোককে এই কর্মে নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাঁরা বিশেষ কিছু করেননি। বর্তমানে সাক্ষরতার যে অভিযান চলছে তাকে অভিনন্দিত করে কমিশন এর দুর্বলতা তুলে ধরেছেন। কমিশনের মতে সাক্ষরতার অভিযান স্বেচ্ছামূলক প্রয়াসের দ্বারা এবং গভীর গণসংযোগের মাধ্যমে সফল হওয়া সম্ভব। তাছাড়া অভিযান লাগাতার চালিয়ে যেতে না পারলে প্রাথমিক সাফল্যও বেশি দিন স্থায়ী হবে না। গত কয়েক বছরে কাজ যে এগিয়েছে তার প্রমাণ পশ্চিম বঙ্গের পাঁচটি জেলার এই অভিযানে সাফল্য, যদিও এই সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই সংশয় পোষণ করেন। তবুও বলব আন্দোলনের প্রকৃতি দেখে আশা করা যায় আন্দোলন আরও সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এর জন্য সর্বাঙ্গে সামগ্রিকভাবে জনসাধারণকে এই আন্দোলনের সামিল করতে হবে।

উপসংহার

ডঃ মিত্রের কমিশন প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করে একটি নজিরবিহীন দলিল খাড়া করেছেন। সেদিক থেকে এটি মূল্যবান। কমিশনের সুপারিশগুলিও মূলতঃ যুক্তিভিত্তিক কিন্তু মূল একটি বিষয়ে কমিশন নজরপাত করেননি। ১৯২৬ সালে রজবউদ্দিন তরফদার যখন তদানীন্তন বেঙ্গল কাউন্সিলে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা উত্থাপন করেন সেদিন প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আইনের আকারে প্রাইমারি শিক্ষা আইন কাউন্সিলে যখন বিবেচিত এবং গৃহীত হয় তখন দেখা গেছে মতান্তর। ধনীলোকেরা এর বিরোধিতা করলেন। এমনকি কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্যয়তামূলক করার কথা যখন ওঠে তখন বাবু ভদ্রলোকেরা প্রকাশ্যে বলেছিলেন তাহলে ঝি-চাকর পাওয়া যাবে না। আর গ্রামের জমিদারবাবুরা বলেছিলেন শিক্ষাকরের অংশ কেন আমরা দিতে যাব? কেননা শিক্ষা ত

পাবে আমাদের প্রজাদের ছেলেরা যারা পরে আর আমাদের মানবে না। আজও যে কোটি কোটি মানুষ অশিক্ষিত তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এর মর্মমূলে রয়েছে এই ধরনেরই মনোভাব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আগে যারা শিক্ষার অনুকূলে আন্দোলন করেছিলেন তাঁরা প্রকৃত শিক্ষার জন্যই চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু স্বাধীনতার পর লক্ষ করা গেল ভিন্ন ধরনের মনোভাব। সেদিকে কমিশন মোটেই নজর দেননি। প্রাথমিক আর মাধ্যমিক শিক্ষার কথাই বলুন অথবা ডুগডুগি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কথাই বলুন সর্বক্ষেত্রেই লোককে শিক্ষিত করার পরিবর্তে শিক্ষাকে বেকার উদ্ধারের কাজে এবং মহিলাদের জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই বিবাহ বৈতরণী পার করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। অভিভাবক দুঃখ করেন, হারামজাদা ছেলে টুকেও পাশ করতে পারলি না—এম. এল. এ. বলেছিল পাশের একটা সার্টিফিকেট আনতে পারলেই স্কুলে চাকরির ব্যবস্থা হবে। এরকম পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ে ঢুকেই কোন রকমে পাশ করার ধান্দা চালু হয়। এই অপ্রিয় কথাগুলি বলতে ভাল লাগে না, কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে রাজনৈতিক লোকেরা এখন শিক্ষাকে সুবিধা আদায়ের একটা সোপান হিসাবেই ব্যবহার করছেন। বিষয়টা সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। আদর্শ নাই, শিক্ষার প্রকৃত প্রসার ঘটানোর মনোভাব নাই। কেবলমাত্র টাকা কামানোই একমাত্র কাম্য। দুর্ভাগ্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালকগণ তাঁদের কাজ করছেন অর্থাৎ শিক্ষকদের জন্য আপ্রাণ করছেন কিন্তু শিক্ষার জন্য কতটা করছেন সেদিকে দৃকপাত করলে হয়ত দেশের অনেক বেশি কল্যাণ হবে।

বাজেট সঙ্কট

সর্বজনীন শিক্ষার নামে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কার্যত বিনা বেতনে পড়ানো এবং শিক্ষকদের সর্বস্তরে বেতন নিশ্চিত করানোর কার্যক্রম বর্তমানে সঙ্কটাপন্ন। বলা যায় শিক্ষার গাড়িটি এখন কাদায় পড়েছে। এর কারণ ক্রমবর্ধমান এই খরচ যোগানোর ক্ষমতা রাজস্ব দপ্তরের নাই। নতুন স্কুলের অনুমোদন কার্যত বন্ধ। এ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে কমিশন এখন বিভিন্ন স্তরে ছাত্রদের টিউশন ফি চালু করার ও শিক্ষাকর ধার্য করার প্রস্তাব দিয়েছেন। মূল দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করে এবং দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত না হয়ে এই ধরনের অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য।

সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ ১৯৩৫ সাল থেকে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। ফলে দেশের তৃণমূলের সমস্যা তাঁর নখদর্পণে। বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার প্রাক্তন আইন মন্ত্রী সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ দেওয়ানী আইনজ্ঞ হিসাবে কলকাতা হাইকোর্টে একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। তাঁর লেখা Laws of Wakfs, ওয়াকফ বিষয়ে অনন্য আইনগ্রন্থ। তাঁর বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতাও ব্যাপক। দরদী শিক্ষাবিদ এবং বিদ্যোৎসাহী হিসাবেও মনসুর হবিবুল্লাহ অনেকের কাছে পরিচিত। দক্ষিণ কলকাতায় একটি আদর্শ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে মূলতঃ তাঁরই উদ্যোগে।

জাত বৈষ্ণব কথা

অজিত দাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুই

গৃহস্থজাত বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে আখড়ার বাবাজীদের সম্পর্ক এখন খুবই ক্ষীণ। বিশেষতঃ নগরের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে সংযোগ নেই বলা চলে। জাত বৈষ্ণব গৃহস্থ পরিবারের দীক্ষাগুরু এখন প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ। তা নিয়ে গৌরববোধও আছে। অর্থাৎ বর্ণাশ্রমী সমাজের ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেও স্বীকৃত। ব্রাহ্মণ দীক্ষাগুরু হওয়ায় জাত বৈষ্ণবের প্রতি বর্ষিত ঘৃণা যেন তাঁদের প্রতি আর প্রযোজ্য নয়, এমন ভাব করেন। এঁদের জীবন যাপন ধারাও বর্ণাশ্রমী হিন্দুর একটি বর্ণের মতই। বৃত্তি ভিত্তিক সমাজে বৃত্তি পরিচয়হীন একটি বর্ণ। জাত পাত ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের মতই রক্ষণশীল। হয়ত তার চেয়েও বেশি।

"বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সমতার তত্ত্ব প্রচারিত হওয়ার ফলে বৈষ্ণবত্বের মধ্যে সংস্কার সহ ব্রাহ্মণত্বের সংক্রাম অনিবার্য হয়ে উঠল।"[১৮]

মন্তব্যটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রসঙ্গে হলেও গৃহস্থ জাত বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনেকের মুখেই শোনা যাবে—আমরা ত শুদ্দুর নই। বামুনের সমান। যুক্তি দেবে, শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈষ্ণব ভোজনও করাতে হয়। নইলে অশৌচ মুক্তি হয় না। তার মানেই হল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমপর্যায়ের।

বস্তুতঃ হিন্দু সমাজ কাঠামোয় ধর্মধ্বজী দুটি সম্প্রদায় যেন পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব। যারা অন্য পরিচয় ছেড়ে শুধুই বৈষ্ণব পরিচয় সার করেছে—তারা ত নিজেদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সোচ্চার হবেই। আমার ঠাকমাকেই বলতে শোনা যেত নবগুণে ব্রাহ্মণ আর অনন্ত গুণে বৈষ্ণব। আমরা বামুনের চেয়ে উঁচু। কত দিন শুনেছি। এবং সেই বালক কালে আকাশ পাতাল ভেবেছি।

এইসব মানসিকতা রক্ষণশীলতাকে লালন করেছে। সদাচারীও করেছে। অনেক বৈষ্ণব পরিবারই ছিলেন নিরামিশাষী। প্রাক স্বাধীনতা কালে জাত বৈষ্ণব পরিবার মাংস ডিম পেঁয়াজ স্পর্শ করতেন না। আমাদের পরিবার অমন রক্ষণশীল না হলেও ওসব জিনিস হেঁসেলে ঢুকত না। বাড়িতেও না। অনেক পরিবার মাছও খেতেন না। এমন পরিবার সংখ্যালঘু হলেও আজও আছেন। তবু ছড়া চলিত আছে :

বোষ্টমা টম টম
ঝুলির মধ্যে মুরগী রেখে
মাংস খাওয়ার যম।

ঝুলির উল্লেখ থাকায়, বোঝা যাচ্ছে যে, ভিক্ষাজীবী বাবাজীদের কটাক্ষ করা হয়েছে। বাবাজীরা সবাই ধোয়া তুলসী পাতা ছিলেন, তা নয়। কিন্তু এ ছড়ার ভিতর দিয়ে একটা সামাজিক সংঘাতের ইঙ্গিত মেলে। প্রথমে বোঝা যায়, বৈষ্ণব সমাজ নিরামিশাষী ছিল। বর্ণাশ্রমী হিন্দু অধিকাংশই তা ছিলেন না। দ্বিতীয় অনুমান হচ্ছে, জাত বৈষ্ণব সমাজকে বর্ণাশ্রমী সমাজ সুনজরে দেখত না। কারণ বর্ণাশ্রমী সমাজ থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ নিয়ে জাত বৈষ্ণব সমাজের পরিপুষ্টি। এরা আবার বর্ণাশ্রম বিরোধী। দল ছুটদের কে আর সুনজরে দেখে? তাই বলা হয়েছে, জাত হারিয়ে বোষ্টম। তাই অনুমান বাঙ্গ বিদ্রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে সামাজিক সংঘাতের ইতিহাস।

যাই হোক, বৈষ্ণব সমাজ বেশ রক্ষণশীল ছিল। বৈষ্ণব পরিবারে ভাতকে বলা হত—অন্ন। আহার বা ভোজনকে বলা হত—সেবা। তরকারি হচ্ছে—ব্যঞ্জন। সাধারণ ঘরে সেটা দাঁড়িয়েছিল—ব্যানন। সব্জী বা কোন কিছুকে কাটা বলা যাবে না। বলতে হবে—বনানো—বানানো আর কি।

তখন বালক বয়স। বিকালে পাড়ার পথ চলতে গিয়ে দেখি, পথের পাশে ঘাসের ওপর কাদের একটা হাঁস ডিম

পাড়ল। আমি ডিমটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি নরম তুল-তুলে। মনে তীব্র কৌতূহল—ডিম নরম কেন? মীমাংসার জন্য কাউকে খুঁজতে গিয়ে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আমার পাঠশালার পণ্ডিত—মহন্ত মশায়। কোন প্রশ্ন করবার আগেই তিনি ধিক্কার দিয়ে উঠলেন, ছিঃ ছিঃ ডিম হাতে নিয়েছিস—বোষ্টমের ছেলে হয়ে! ফেলে দে—চান করগে যা—।

বিকালে স্নানের ভয়ে বাড়িতে সে কথা আর বলিনি। কিন্তু মনের ভিতর কেমন অপরাধবোধ কাজ করেছিল। আমরা বোষ্টম—ডিম ছুঁতে নেই। পাড়ার নবশাক সমাজ থেকে আমরা ভিন্ন, স্বতন্ত্র।

প্রতিবেশীরাও এই মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য দায়ী। বসাক বাড়িতে বন্ধুর কানে সুতো—কর্ণবেধ অন্নপ্রাশন হল সাড়ম্বরে। সামিয়ানা টাঙান হয়েছে। ঢোল কাঁসি বাজছে, পুরোহিত বসে মন্ত্রপাঠ করছে, বেল কাঠ পুড়িয়ে হোম হচ্ছে। বন্ধু মাথা ন্যাড়া করেছে। সূচ দিয়ে কান ফুটো করে লুদু মাখা সুতো পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ি ভর্তি লোক। বেশ মজা লাগছিল। দুপুরবেলা ভোজ শুরু হল। বলা হল, ছোট ছেলেরা সব বসে পড়। উঠোনে বসে পদ্মপাতায় ভোজ খাওয়া। বালকের দল উঠোনে বসে পড়লাম যে যার বন্ধুর পাশে। সহসা গৃহকর্ত্রী এসে আমার কান চেপে ধরলেন। তিনি পাড়াতুতো ঠাকমা। বললেন, ওঠ, এখান থেকে।

বন্ধুদের সামনে কান ধরায় খুব রাগ হল। বললাম, কেন উঠব?

তিনি বললেন, এখানে বসবিনে, উঠে আয়। মা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। বললেন, ওখানেই বসুক খুড়িমা। তাতে কী হয়েছে?

না বৌমা। বাড়িতে শুভ কাজ। কোথায় খুঁত হয়ে যাবে। বলে তিনি আমাকে ঘরের বারান্দায় নিয়ে এলেন। আসন পেতে বসিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি হচ্ছ গুরুঠাকুর—বোষ্টম। এখানে বস। আমার পাশে দুজন বয়স্ক ব্রাহ্মণ বসলেন।

বিজয়া দশমীর রাতে সেকালের গ্রামে বালকদের আনন্দের বিষয় ছিল, পাড়ায় গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে প্রণাম করা এবং প্রচুর নাড়ু, পকান্ন ইত্যাদি খাওয়া। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একবার বেরিয়ে পড়লাম। গৃহস্থরা পাড়া-তুতো নানা গুরুজন সম্পর্কে পরিচিত। জ্যাঠা, কাকা, দাদা, পিসেমশায় ইত্যাদি। কিন্তু কেউ আমাকে প্রণাম করতে দেয় না, লাফিয়ে ওঠে—পাপ হবে গো—বলে। কেউ আমাকেই প্রণাম করতে আসে। মহিলারা ত গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে প্রণামই করল আমাকে। আমি যারপর নাই অপ্রতিভ। লজ্জায় রণে ভঙ্গ দিলাম। কোনদিন ও পথে হাঁটিনি।

এসব কথা বলার কারণ এই যে, আমি বৈষ্ণব, বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র এই ঘোষণা সমাজ থেকেই উঠে আসছে। সমাজ-মানসই, আমার মানস-লোককে গড়ে তুলছে—আমাকে স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট হতে বলছে। আমার ধারণা, ব্রাহ্মণ সন্তানদের স্বাতন্ত্র্যবোধও এভাবেই পুষ্ট হয়ে ওঠে। এতে যেমন অহং-বোধ এবং জাত্যাভিমান জন্ম দেয়, তেমনই কিছু সদাচারী ভূমিকা পালনেরও দায় বর্তায়।

জাতবৈষ্ণব সমাজে তাই যেমন কিছু সদাচারী ভূমিকা দেখা যায়, তেমনই রক্ষণশীলতা এবং জাত্যাভিমান দ্বারাও আক্রান্ত। যাঁদের ঠাকুর বাড়ি আর বিগ্রহের নিত্য-পূজার ব্যবস্থা আছে—তাঁদের ত কথাই নেই। বেশি রক্ষণশীল।

জাত বৈষ্ণব গৃহস্থ পরিবারে বিধবা বিয়ের প্রচলন নেই। এই সমাজে কৌলীন্য বা বনেদিয়ানা বিচার হয় কে কত পুরুষ ধরে এই সমাজভুক্ত তার হিসাব দিয়ে। এবং এই সঙ্গে কে কোন গুরুর শিষ্য তার পরিচয়ে। যে যত প্রাচীন পরিবার সে তত বনেদি।

জাতে ওঠার ব্যাপারও আছে। আমাদের পাড়ায় একটি জাত বৈষ্ণব পরিবার ছিল। তারা নিম্ন বর্ণ থেকে আগত। এবং মাত্র এক পুরুষ আগে ধর্মান্তরিত। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য করে ধনশালী হয়েছে, পাড়ার মধ্যে সেরা দোতলা বাড়ি করেছে। বাড়ির ছেলে মেয়েদের জেল্লাদার পোশাক! সে বাড়ির একটি মেয়ে পাঠশালায় আমার সঙ্গে পড়ত। সে বলত, আমরা এক জাত। তুই আমার বন্ধু। সে আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যেত। বাড়িটা আমার খুব ভাল লাগত। আর 'এক জাত' কথাটা শুনে খুব আপন বলে মনে হত।

কিন্তু মা একদিন বললেন, ওদের বাড়িতে যাবিনে। ওরা নিচু। আমাদের সঙ্গে চলে না।

এই নিচু পরিবার তাদের ছেলের বিয়ে ঠিক করলেন এক

বনেদি মহন্ত পরিবারে।

প্রথমে মহন্তরা রাজি হননি। কিন্তু তাঁরা দরিদ্র। ছেলের বাবা বললেন, কোন খরচা লাগবে না। আপনাদের দিকের যাবতীয় খরচ আমি দেব। আপনাদের পক্ষ থেকে মেয়ে জামাইকে যা দান সামগ্রী দেবার কথা—সে সব আমি কিনে দেব। আমি শুধু মেয়েটা চাই, আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা চাই।

মেয়ে পক্ষ মহন্তরা রাজি হয়ে গেল। বিয়েও হয়ে গেল। আর নিচু পরিবার জাতে উঠে গেল।

পরে অনুসন্ধানে জেনেছিলাম, সেই বনেদি মহন্ত পরিবারের আদি পদবী ছিল দাস। তারপর কোন এক সময়ে আদালতে এফিডেভিট বলে মহন্ত পদবী বলবৎ হয়েছে। কৃষ্ণনগরে এক বনেদি মহন্ত পরিবারের একজন আমাকে ওই মহন্ত পরিবার সম্পর্কে বলেছিলেন, ওঁরা খুব উঁচু মহন্ত, আমাদের আত্মীয়। আমি মনে মনে হেসেছিলাম।

কৃষ্ণনগরে জাত বৈষ্ণব সমাজের অনেকেই উপরীত ধারণ করেন। নদীয়া মুর্শিদাবাদ উত্তর বঙ্গে এই প্রথার চল। বাঁকুড়া মেদিনীপুরে ভেক প্রথা নেই। উপবীতও নেই বলে শুনেছি। যাদের দেখেছি তাদের কারও উপবীত দেখিনি। কলকাতা হাওড়া হুগলি চব্বিশ পরগণার সঠিক সংবাদ আমার জানা নেই। তবে গোত্র একটাই—অচ্যুতানন্দ গোত্র।

গৃহস্থ পরিবারে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি দেখা যায় না তেমন—বিশেষতঃ শিক্ষিত পরিবারে। জাতি গোত্রের খোঁজ পড়ে ছেলে মেয়ের বিয়ের সময়। বিয়ে হয় নিজ সমাজের মধ্যেই। বর্ণাশ্রমীদের মতই মানসিকতা। নিজের সমাজের বাইরে সম্পর্ক নিয়ে বলবে, বেজাতে বিয়ে দেব কেন? কেউ তেমন বিয়ে দিলে, মুখ বেঁকিয়ে বলবে, যত ভালই হোক, বেজাতে ত বিয়ে।

বর্ণাশ্রমী উচ্চবর্ণের বৈষ্ণবদের পদবী হচ্ছে: অধিকারী, আচার্য, আচারি, ভারতী, দণ্ডী, দাস, দেবাধিকারী, দেব গোস্বামী, মহন্ত, পুরী, পূজারী, পাণ্ডা, সাধু, ঠাকুর, উপাধ্যায়, ব্রজবাসী।

জাত বৈষ্ণব সমাজের পদবী প্রধানতঃ বৈরাগ্য, দাস বৈরাগ্য, দাস, মহন্ত, গোস্বামী, অধিকারী, দাস অধিকারী, ঠাকুর, দাসঠাকুর, ফৌজদার, আখড়াধারী ইত্যাদি।

উপবীতধারী এবং উপবীত বিহীন পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধা নেই এবং প্রচলিত। কারণ উপবীত বৈষ্ণবের চিহ্ন নয়। বাহুল্য। গৃহস্থ বৈষ্ণবরা ভিক্ষাজীবী নয়। বৈষ্ণবদের নির্দিষ্ট বৃত্তি পরিচয় নেই। কারণ বৃত্তিভিত্তিক সমাজের বাইরে তাদের অবস্থান। জাত বৈষ্ণব সকল পেশাতেই নিযুক্ত। এদের যেমন পাওয়া যাবে ভিক্ষাজীবী কি খেত মজুর হিসাবে, তেমনই মিলবে স্কুলে কলেজে শিক্ষকতায়, গবেষণাগারে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসে, দেশের কলে কারখানায়, সরকারি দপ্তরে, আদালতে উকিল কি হাকিম বেশে, আবার সমাজ সেবায় অঞ্চল পঞ্চায়েতে কি বিধায়কের ভূমিকায়। কেউ আবার ডাক্তার কি ইঞ্জিনীয়র। মেয়েরাও গবেষিকা, অধ্যাপিকা, শিক্ষিকা, কেউ গ্রাজুয়েশনের সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরি সন্ধানে ঘুরছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে, আখড়া ছাড়া এদের স্বতন্ত্র কোন মঠ মন্দির নেই। স্মৃতিগ্রন্থও নেই। এদের পরিচয়—এরা বর্ণাশ্রমী নয়। যে কেউ ভেক নিয়ে এই সমাজভুক্ত হতে পারে।

'হরিভক্তি বিলাস' নির্দেশিত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মতভেদ বা বিরোধ শুরু হয়েছিল প্রথম থেকেই, মীমাংসা হয়নি কোনদিনই। ব্রাহ্মণ নেতৃত্বের প্রবল চাপে তা চাপা পড়েছে মাত্র। বিদ্রোহী কণ্ঠ সম্পূর্ণ নীরব হয়নি। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সমতার দাবি উঠেছে বারংবার।

মেদিনীপুরের শ্যামানন্দ সম্প্রদায় এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সচেতন ও সোচ্চার ছিলেন। তারপর কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজ। কলকাতার সুবর্ণবণিক কোটিপতি মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪) ধর্মসভার কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন বৈষ্ণবদের দাবি সম্পর্কে বিবেচনা করতে। লিখিত মুদ্রিত দাবিপত্রই পেশ করেছিলেন। সে দাবিপত্র আমি পড়িনি। অন্য গ্রন্থ মধ্যে তার উল্লেখ পেয়েছি। দাবি ছিল: বৈষ্ণব যে কোনও বর্ণের হোক, তার সামাজিক মর্যাদা উঁচু হবে।

সুবর্ণ বণিক সমাজের এই দাবি সম্পর্কে ভাবতে গেলে ঐতিহাসিক পটভূমির কথা মনে জাগে। সুবর্ণবণিক সমাজ আদিতে ছিলেন বৌদ্ধ। বৌদ্ধ সমাজে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ছিল অতি উচ্চে। তাই তাঁরা বল্লালী সমাজে প্রবেশ করেননি। নিত্যানন্দর কাছে উদ্ধারণ দত্ত প্রথম আত্ম-

সমর্পণ করেন বৈষ্ণবীয় উদারতাকে বিশ্বাস করে। শেষে বৈষ্ণব সমাজও হল বর্ণাশ্রমী এবং ব্রাহ্মণ হল তার নিয়ন্ত্রক। স্ববর্ণবণিক সমাজ তাই আশাহত। স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তাই আবেদন জানিয়েছিলেন মতিলাল শীল। বলা বাহুল্য তাঁর সে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসভা জানিয়েছিলেন যে ব্রাহ্মণ সকল সময়েই শূদ্র বৈষ্ণবের চেয়ে উঁচু।

মতিলাল শীল আর অগ্রসর হননি।

কিন্তু স্ববর্ণবণিক জমিদার ভৈরবচন্দ্র দত্ত ১৮৩২ সালে প্রচারপত্র ছাপিয়ে তাতে সরাসরি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে লিখেছিলেন যে, বৈষ্ণব সর্বশ্রেষ্ঠ। বর্ণ যাই হোক, যে বৈষ্ণব সে-ই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের চেয়ে খাটো নয়। বৈষ্ণব হবার পর ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি অসার।

এই অস্বীকৃতির ফলাফলও—শূন্যতা—নিষ্ফলতা ছাড়া আর কী হবে?

জাত বৈষ্ণব সমাজের এসব চিন্তা নেই। তারা ত বর্ণাশ্রমী নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের রূপাভাজনও নয়। তারা নিজেদের শূদ্রও ভাবে না। তারা বৈষ্ণব। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।

গোবিন্দ দাস। সম্পর্কে বেহাই মশায়। নিকট সম্পর্কেই। তাঁর মেয়ের বিয়ের সময় পদবী ছিল দাস। ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রে হয়েছেন গোস্বামী।

এটা কেমন হল?

গোঁসাই হয়ে গেলাম। দাসত্ব ছেড়ে প্রভুত্ব।

হঠাৎ?

ছেলেদের আর ওদের মার ইচ্ছায়।

ইচ্ছার কারণ?

সামাজিক জটিলতা।

কী রকম?

সে এক কাণ্ড। ছেলেদের এক মামা কিছুকাল আমার বাড়িতে ছিল। সে সময় প্রতিবেশী এক বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ভাব ভালবাসা করে বিয়ে করে ফেলল। তার পদবী অধিকারী। কিন্তু আমরা দাস। এখন জামাইকে ব্রাহ্মণ পরিবার চাপ দিচ্ছে, দিদিকে বল পদবী পাল্টাতে। দিদি আর তার ছেলেরা লেগে পড়ল। তাই কুটম্বর মান বাঁচাতে একেবারে গোস্বামী। বৈষ্ণব পরিচয়ও থাকল। ভবিষ্যতে ছেলেরা বামুনের ঘরে কাজ করতে পারবে।

তাহলে আমাদের ত্যাগ করছেন?

আপনারাও চলে আসুন। থামকা দাস-খৎ নিয়ে পড়ে পড়ে মার খাওয়া। জাত বৈষ্ণবের মান আছে নাকি? আমাদের ত সুবিধে আছে। বামুনের মত পদবী আছে। উপবীতও ধারণ করা যায়।

উল্টো দিকটা ভেবে দেখেছেন?

কী সেটা?

আবার সেই ব্রাহ্মণের পপ্পরে পড়া। আবার সেই জাত পাত উঁচু নিচু—

বেহাই মশায় হেসে চায়ে চুমুক দিয়ে মউজ করে বসে, বললেন, আপনি কে মশায়? বামুনকে রুখবে কে? বুদ্ধদেব পেরেছেন? পাঠান মোগল, ইংরাজ—কেউ পেরেছে? জাত বৈষ্ণবও আর পারবে না। এদেশে ব্রাহ্মণেরই লীলা।

কী রকম?

বৈষ্ণব আন্দোলনের লোকরা ব্রাহ্মণ, বিরোধীরাও ব্রাহ্মণ। ঘরে ঘরে লড়াই। কলকাতার ব্রাহ্ম আন্দোলনও তাই।

কেন, কেশব সেন?

সেবক অনুগামী মাত্র। নেতা ব্রাহ্মণ। একালের সাহিত্য সংস্কৃতি সবই ত উপাধ্যায়দের কীর্তি। পাশে ঘোষ বোস মিত্ররা আছেন নিচের থাকে। বর্ণাশ্রমকে জানান দিতে। রাজনীতিতে ডান, বাম, অতিবাম—কোনদিকে তাকাবেন সর্বত্র—নেতা ব্রাহ্মণ। নৈবেদ্যর ওপর তুলসীপাতার মত। অনুসন্ধানে দেখতে পাবেন হয়তো ডোম ইউনিয়নের সভাপতিও ব্রাহ্মণ। গান্ধীজী মহামানব। আমৃত্যু জাত পাতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। হরিজন সেবা করেছেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস—দক্ষিণী ব্রাহ্মণ রাজাগোপালাচারী তাঁর বেহাই। আভা চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাত বউ। হরিজন সেখানে প্রবেশাধিকার পায়নি।

বেহাই গোবিন্দ গোস্বামী হেসে নজরুলের গান আবৃত্তি করলেন, জাতের নামে বজ্জাতি সব। তারপর প্রশ্ন তুললেন, বলুন, এ গান শুনে বাবুরা কত মাতামাতি করেন, কিন্তু কত জন জাত পাতের বাইরে এসে দাঁড়াতে পেরেছে? কত হুংকার শুনি—ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। কজন পৈতে ছেড়েছে? কজন নিজে এবং আত্মীয়দের বিয়ে দিয়েছে

জাতপাতকে অস্বীকার করে, সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, সামাজিকতার মধ্যে, নীতি হিসাবে। খবরের কাগজের পাত্রপাত্রী বিভাগের বিজ্ঞাপন পড়ুন। কায়স্থ লিখছে, স্ব অথবা বৈদ্য কি ব্রাহ্মণ চলিবে। বৈদ্য লিখছে, ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ চলিবে। অন্যরা লিখছে, উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। যোগী সম্প্রদায় লিখছেন, তাঁরা নাথ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বা উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। উচ্চ অসবর্ণ বলতে কী বোঝায় তাঁরাই জানেন। মনে হয়, কায়স্থ আর বৈদ্য। নবশাক সমাজের সবাই একে অন্যকে নিচু ভাবেন বলে মনে হয়।

এর অর্থ ত কেউ আর নিজের সম্প্রদায়ে আবদ্ধ থাকতে চায় না। মিলে মিশে একাকার হতে চায়।

না। সবাই নিজেকে নিচু ভাবছে। উঁচু হতে চাচ্ছে। যেহেতু ব্রাহ্মণ সকলের ওপরে বসে আছে, তাই এখন সবাই তার ন্যাজ ধরতে চাচ্ছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ লেখে না, অসবর্ণ চলবে। কাকে সে চাইবে? ব্রাহ্মণ ছাড়া সবাই যে নিচু, —শূদ্র।

তাহলে ধর্মযোদ্ধা ব্রাহ্মণ নিজের অধিকার ঠিক বজায় রাখল?

অবশ্যই আজ পর্যন্ত কেউ তার অধিকারকে অস্বীকার করতে পারল না। কেবল জাত বৈষ্ণব সমাজ রুখে দাঁড়িয়েছিল। শেষ অবধি হেরে গেল।

কেন?

শিখদের মত সংগঠন করতে পারেনি। এখন ত মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ আর বর্ণাশ্রমীদের দখলে।

মহাপ্রভু বেদখল?

ভেবে দেখুন, মহাপ্রভুর সে ভক্তি ধর্ম কোথায়? শাস্ত্র আর আচারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেল। শিবের জটায় গঙ্গার আবদ্ধ হওয়ার মত।

তাহলে বৈষ্ণব আন্দোলন ব্যর্থ? সমাজ সংহতি হল না?

ও পথে আসা সম্ভব ছিল না।

কোন পথে সম্ভব?

আমাদের পথে। পদবী পাল্টানো, উপবীত ধারণ। আর ব্রাহ্মণ সমাজে মিশে যাওয়া। শুধু আমরা কেন, সমগ্র বাঙালি হিন্দুরই নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করে দেওয়া উচিত। ন্যাঠা চুকে যায় তাহলে।

ও ত চোরা পথ। ছলনা।

যুদ্ধে প্রেমে নিয়ম নাস্তি। এটা ত ধর্মযুদ্ধ। এভাবে সমস্ত হিন্দু সমাজ যদি ব্রাহ্মণ হয়ে যেতে পারে, আর কোন সমস্যাই থাকবে না। সমাজ সংহতি নিয়ে হাহাকার করতে হবে না।

এ ভাবে কি হয়?

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষে এ ভাবেই ত আর্যকরণ হয়ে আসছে। নৃতত্ত্ব তার সাক্ষ্য দেবে।

বেহাই মশায়ের কথা শুনে সেদিন খুব হেসেছিলাম। কিন্তু হাসবার কথা তো নয়। তাচ্ছিল্য করার উপায় নেই।

স্থানীয় এক সাহিত্যিক বন্ধু দেখা করতে এলেন। তিনি ব্রাহ্মণ। বললেন, ক'দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম বলে আসতে পারিনি।

কিসের ব্যস্ততা?

এক আত্মীয়ের মেয়ের বিয়ে ছিল। আজ কারও মেয়ের বিয়ে হল শুনলে মনটা যেন স্বস্তিতে ভরে যায়। মনে হয় বড় ভাগ্যবতী মেয়ে। উচ্চশিক্ষিতা চাকুরি করা মেয়েদেরও দেখি—বড় বিষণ্ণ মুখ, বিয়ে হয় নি, নিজের সংসার হয়নি।

এই প্রসঙ্গেই আলোচনা শুরু হয়েছিল। এক সময় তিনি বলে উঠলেন, বিবাহ বাসরে দেখলাম সজনী মহন্ত খুব মোড়লি করছেন। আপনি চেনেন তাঁকে?

না।

আমার পরিচিত। রিটায়ার্ড ভদ্রলোক। শিক্ষিত, রুচিশীল ব্যক্তি। কথা বলে খুব আনন্দ হয়। তিনি ওখানে বরপক্ষের মধ্যে ঘুরছেন। গিয়ে বললাম, আপনি এখানে? তিনি বললেন, বর যে আমার শ্যালিকা পুত্র। যাক, সেই ভিড়ের মধ্যে গল্প করার মত একজনকে পাওয়া গেল। সাহিত্যিক বন্ধু হাসলেন। এবং তারপরই বললেন, বুঝলাম, উনি তাহলে আপনাদের মহন্ত নন। আমার কিন্তু ধারণা ছিল, আপনাদের সমাজভুক্ত।

না। তা হবে কেন? মহন্ত পদবী কায়স্থ, ব্রাহ্মণ এবং আরও অনেকের মধ্যেই হয়ত আছে।

হ্যাঁ, ওরা ব্রাহ্মণ।

এরপরই মনে কেমন খটকা লাগল। বললাম, আচ্ছা, শিক্ষকতা করেন ওই যে রজনী মহন্ত—ওঁর কেউ হন নাকি সজনী মহন্তর? নামের মিল দেখে বলছি।

বন্ধু বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। রজনী মহন্তর দাদা

উনি।

তাহলে যে গোলমেলে ব্যাপার হয়ে গেল ভাই।

কেন?

ওঁদের ভগ্নীপতি যে সুধাকান্ত দাস। তাঁর বোন যে আমাদের ঘরের বউ।

বন্ধু হকচকিয়ে গেলেন।

বললাম, অবশ্য এমন হতে পারে যে সজনীবাবু ব্রাহ্মণ পরিবারে বিয়ে করেছেন, অথবা তাঁর শ্যালিকার বিয়ে হয়েছে ব্রাহ্মণ পরিবারে।

বন্ধু বিব্রতভাবে বললেন, না পাত্রের পদবীও মহন্ত।

পদবী মহন্ত এবং উপবীত ধারী। সহজেই ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পরিচিত পরিবেশে এটা কী ভাবে সম্ভব হচ্ছে? কন্যা পক্ষই বা অনুসন্ধান না করে অগ্রসর হচ্ছেন কী ভাবে? বিশেষতঃ উভয় পক্ষই যখন পশ্চিম বঙ্গীয়?

এ ক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে কন্যাপক্ষ জ্ঞাত সারেই অগ্রসর হয়েছেন। উপবীত আছে। পদবী মহন্ত, পাত্র সুযোগ্য। অতএব গ্রহণ যোগ্য। এ যুগের সমাজ নলচের আড়াল দিয়েই তুষ্ট। জাতবৈষ্ণব সমাজে ইদানীং তাই দেখা যাচ্ছে, উপবীত আর পদবীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। লক্ষ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি।

আমার সেই আত্মীয় যিনি কাঁঠাল পোতা পল্লীতে মালা চন্দন করে বিয়ে করেছিলেন, তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ পরিবারে। তিনি থাকেন ব্যারাকপুরে। ছেলে ইঞ্জিনীয়র হয়েছে। তার বিয়ে দেবেন। আমার বাড়িতে বসেই বললেন, অনেক সম্বন্ধ আসছে। একটা চিঠি এসেছে একজন খ্যাত নামা সাহিত্যিকের পরিবার থেকে। পাত্রী তাঁর ভাগ্নী।

ব্রাহ্মণ?

হ্যাঁ চট্টোপাধ্যায়।

আপনার পরিচয় জানে?

হ্যাঁ, মহন্ত। আমরা বৈষ্ণবদের ব্রাহ্মণ।

আপনার যে পৈতে নেই?

চেনা বামুনের পৈতে লাগে না।

চেনা কী রকম?

আমরা মহন্ত, জামাই চক্রবর্তী। বৈষ্ণবদের বামুন ছাড়া শূদ্রের সঙ্গে কাজ করা ঠিক নয়।

কেন?

হিন্দুর মধ্যে ধর্মকর্ম নিয়ে থাকা সম্প্রদায় দুটো। ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব।

তা ত বুঝলাম। বৈষ্ণব ছেড়ে ব্রাহ্মণে যাচ্ছেন কেন? দুটো সম্প্রদায় মিশে যাওয়াই ভাল।

তাহলে ছেলের বিয়েটা বৈষ্ণবের ঘরে দেওয়া ভাল, মেয়ে ব্রাহ্মণের ঘরে, ছেলের বউ বৈষ্ণবের ঘরের।

না। তিনি বললেন, বৈষ্ণব বলে পৃথক কোন সমাজ থাকা ঠিক নয়।

নিজের ছেলের বিয়ে দেওয়ার সময়েও হল এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। এক কন্যার পিতার চিঠি এল, দাদা, আমার মেয়েটিকে নিন। মাকে বললাম, একদিন বাড়িতে নারায়ণ পুজো দেবার ইচ্ছে হয়েছিল তোমার। পুরোহিত পাওনি। সেদিন সেখানকার পুরোহিতরা বলেছিলেন, বৈষ্ণব বাড়িতে পুজো করব না। সেদিন সেই পুরোহিত সমাজের যিনি নেতা বা অভিভাবক বা প্রধান ছিলেন, আজ তাঁর নাতনিকে তোমার নাত বউ করার জন্য প্রস্তাব এবং অনুরোধ এসেছে।

মা বলে উঠলেন, অমন কাজও করো না।

কেন? বামুন যদি এগিয়ে আসতে পারে, আমরা পিছিয়ে যাব কেন? বরং আমাদেরই জাত বিচার থাকার কথা নয়। সবাইকে নিয়েই ত আমরা। মা বললেন, সে তুমি ভেবে দেখ কী করবে। তবে, আমার মন সরছে না। সে মেয়ে এসে মনে সুখ পাবে না। তোমার ছেলেও সে বাড়িতে গিয়ে জামাই আদর ঠিক মত পাবে না। ছুঁচো গেলা দশা হবে। নিজের মধ্যে থাকাই ভাল।

আমার তখন পাত্রী নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত। নতুন করে আর যোগাযোগের প্রয়োজন ছিল না। পরে কন্যার পিতার সঙ্গে দেখা হলে বললাম, তোমাদের যখন এমনই ইচ্ছা ছিল, তবে আগে বলোনি কেন?

তিনি বললেন, আগেই বলতাম। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আপনার 'দাস' পদবী। অধিকারী, মহন্ত কি গোস্বামী হলে আর দেরি করতাম না। শিক্ষা দীক্ষা আচার বিচারে ত কোন ভেদ নেই আমাদের সঙ্গে।

বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রথম যুগে কত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ

বৈষ্ণবতায় এসে ব্রাহ্মণ পদবী ত্যাগ করে দাস পদবী গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা অবশ্য গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। অন্যদিকে বৈষ্ণব গুরু ব্রাহ্মণ গৃহস্থরা কেউ দাস পদবী গ্রহণ করেননি। ফলে দাস পদবী সমাজ জীবনে কৌলীন্য বঞ্চিত।

আমাদের এই কৃষ্ণনগর শহরেই বাস করেন এক ভদ্রলোক। একটি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। আত্মীয়ার বিয়ের জন্য পাত্র সন্ধানে একদিন আমার কাছে এলেন। পরিচয় হল। বললেন, আমরা উদ্বাস্তু। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত। আমি অবশ্য তখন খুব ছোট ছিলাম। আমার এখানেই পড়াশোনা।

আপনাদের পরিবার কি গুরুগিরি করত?

কেন বলুন ত।

অধিকারী পদবী কিনা। না, না। আমাদের 'দাস' পদবীই ছিল। আমিই অধিকারী হয়েছি।

কেন?

সে এক কাণ্ড। বাবা মারা গেলেন। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। প্রতিবেশীরা বলল, পদবী পালটাও। বললাম, কেন? পাড়ার মুচিরা রুইদাস লিখত। এখন দাস লিখছে। তোমাকে পদবী পালটাতে হবে। কী হব? তুমি অধিকারী হও। তারাই কোর্টে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিল। আমি সেই থেকে অধিকারী।

প্রায়ই শোনা যায়, এখন জাত পাত বিচার নাকি গৌণ হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের মুখে কত আস্ফালন বাণী শুনি। সে সব কত যে ফাঁকা। সমাজ চলেছে আপন পথে। স্বাধীনোত্তর দেশে জাত পাত বিষয়ে সচেতনা অর্থাৎ গোঁড়ামি বোধহয় বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। খুঁচিয়ে ঘা করার মত ব্যাপার। যারা সুযোগ ভোগী তারা নিজেদের আরও বেশি করে স্বতন্ত্র রাখতে চায়। এ ঘটনা ত তারই সাক্ষ্য প্রমাণ।

অধিকারী মশায় বললেন, আরেকটা মজার খবর শোনাই। আমার স্কুলের কাছে একজন কবিরাজ আছেন। তিনি একদিন বললেন, আমি আপনার স্বজাতীয়।

বললাম, আমি ত ব্রাহ্মণ নই, বৈষ্ণব।

তিনি বললেন, আমিও বৈষ্ণব।

আপনার পদবী যে বন্দ্যোপাধ্যায়?

হ্যাঁ। আসলে দাস। ওপার বাঙলা থেকে চলে আসার সময় বর্ডার স্লিপ দিল। তখন কী মনে হল লিখিয়ে নিলাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভালোই ত হয়েছে।

ভদ্রলোক বললেন, না, না। কোন ভাল হয়নি। মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভুগে মরছি। কাউকেই বলা যাচ্ছে না। শুনলে লোকে জোচ্চোর বলবে, ব্যবসার ক্ষতি হবে। নিজের সমাজও পাচ্ছিনে। খুবই মুস্কিলে পড়েছি মশায়।

আজ উপবীত এবং পদবী ব্রাহ্মণত্ব লাভের সহজ উপায়। আমাদের এই শহরেরই এক ভদ্রলোক—আমাদেরই লতায় পাতায় টানা আত্মীয়—একখানা নিমন্ত্রণ পত্র এনে আমার হাতে দিলেন। মুখে বললেন, ছেলের ভেক দিচ্ছি। যাবেন।

পত্রখানি পড়ে বললাম, ভেক ত লেখেননি। উপনয়ন লিখেছেন যে। ভেক হবে না তাহলে?

তিনি একগাল হেসে বললেন, হ্যাঁ ভেকই হবে। আজকাল শহরের ব্যাপার—বোঝেন ত। ভেক ব্যাপারটা কেউ বোঝে না। শুনে হাসাহাসি করে। তাই উপনয়নই লিখলাম। ব্যাপার ত একই—উপবীত গ্রহণ। আমাদের ত পৈতে আছেই। মহাপ্রভুর ভোগ দিয়ে, কীর্তন করেই হবে। তবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা না করে ঘরে বসেই 'ভিক্ষাং দেহি' বলবে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা ছাড়া আর উপায় কী?

ভাবতে গেলে স্বতঃই মনে হয়, এসবই ত ব্রাহ্মণারীতির অনুকরণ-জাত। ব্রাহ্মণ হতে চাওয়া এবং হতে না পারার প্রতিক্রিয়া জাত। অর্থাৎ নকল নবিশী। নকলের পথ বেয়ে যদি আসলে পৌঁছে যাওয়া যায়।

আমার ভাইয়া ভাই-এর দুই ভাই-এর ছেলেদের ভেক হয়েছে শুনলাম। ওঁদের পদবী 'দাস'। এবং ওঁদের পরিবারে উপবীত ধারণ প্রথা নেই। কিন্তু শুনলাম, এক ভাই-এর ছেলেরা উপবীত ধারণ করেছে।

কেন?

ছেলেদের মায়ের ইচ্ছা।

মায়ের এমন ইচ্ছার কারণ?

কারণটা হচ্ছে, মায়ের বাপের বাড়ি এবং দিদির বাড়িতে সকলে উপবীত ধারী। তাঁর ছেলেদের পৈতে না থাকলে কেমন নেড়া নেড়া লাগবে। আর নিচু মনে হবে।

ওঁদেরই একজন বললেন, পৈতে থাকা ভাল। মনে একটা অন্যরকম ভাব হয়।

পদবী যে দাস?

তা হোক। পৈতেধারী দাস। তার মানে উঁচু পর্যায়ের। বনেদি।

কৃষ্ণনগরের সেই পুরোহিত ভদ্রলোক দাস পদবী ছেড়ে অধিকারী পদবী নিয়েছেন। পথে দাঁড়িয়ে তিনি নিজেই আমাকে শোনালেন সংবাদটা। বললেন, এতকাল চাকরি করতাম। এখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে পুরোহিতের কাজ করি, ভোগরাগাদিই। তাই অধিকারী পদবীটাই নিলাম।

হেসে বললাম, ভালই করলেন। কিন্তু পৈতেটা নিলেন না যে?

তিনি সলজ্জ ভঙ্গিতে হেসে বললেন, কাকীমা কলকাতা থেকে এলেই বলেন, তোমরা করছ কী? আমরা কবে পদবী পাল্টে ফেলেছি। তোমরা এখনও দাস হয়ে পড়ে আছ? ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎটা ভাবা উচিত।

কাকীমা কী পদবী নিয়েছেন?

ওঁরা এখন বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছে সব ব্রাহ্মণ পরিবারে। বৈষ্ণব বলে আর নিজেদের পরিচয় দিতে চায় না।

আমার ভাই দুর্গাপুরে একটি পরিচিত পরিবারে গিয়েছিল মেয়ের জন্য পাত্র সন্ধানে। তাদের পদবী অধিকারী এবং উপবীত ধারী। গৃহকর্ত্রী বলেছেন, আমরা অধিকারী, ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের ঘরেই কাজ হয় আমাদের।

কিন্তু আপনি ত দাস পরিবারের মেয়ে।

হ্যাঁ। তা ঠিকই। কিন্তু এখন আর এরা বৈষ্ণবের সঙ্গে কাজ করবে না বলছে। বামুন থেকে বৈষ্ণব হয়েছিল ত। এখন আবার বামুন হয়ে যাবে।

একই অভিজ্ঞতা হল আমারও। একটি জাত বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে অধ্যাপক হয়েছে। ছেলেটি আমারই এক অধ্যাপক বন্ধুর ছাত্র। এবং বন্ধুর বিশেষ প্রিয় ভাজন। ভাইঝির কথা ভেবে বন্ধুকে ছেলেটির কথা বললাম। যদি বিয়ে করতে সম্মত হয়।

বন্ধু ছেলেটির সঙ্গে আলোচনা করে এসে জানালেন, হবে না। কারণ ওরা বৈষ্ণব হলেও ব্রাহ্মণ। এখন পদবী অধিকারী। আদিপুরুষ মুখোপাধ্যায় থেকে অধিকারী হয়েছিলেন। এখন ব্রাহ্মণের মেয়ে খুঁজছে।

যুক্তির মধ্যে যে একটা ফাঁক আছে সেটা ওরা দেখছে না। অধিকারী পদবী বলেই যে আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিলেন, এটা প্রমাণসিদ্ধ নয়। যদি ব্রাহ্মণে হয়ও—এই ক পুরুষ ধরে কি ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করা হয়েছে? পরিবারের আত্মীয় স্বজন সকলেই কি ব্রাহ্মণ বংশজাত? মাঝের মিশ্রণের কী হবে?

মজার কথা হল, কিছুদিন পরেই অধ্যাপক বন্ধু বললেন, অধিকারী ছেলেটির একটি বোন আছে। তার বিয়ে দিতে চায়। আপনার সন্ধানে কোন পাত্র আছে?

ব্রাহ্মণ পাত্র?

না। বৈষ্ণব পাত্র।

ওরা যে ব্রাহ্মণ সন্ধানী?

অধ্যাপক বন্ধু হেসে ফেললেন। বাদ দিন। আপনাদের এক আজব সমাজ।

মাতুলালয়ে পুত্রবধূ ব্রাহ্মণ কন্যা। মামা বললেন, কী করব বল? ছেলে বলল, ওই মেয়েকে বিয়ে করব। কন্যা পক্ষও সম্মত। আমি আর অমত করে কী করব? তাছাড়া বৈষ্ণবের আবার জাত বিচার কী? হরি বলে যে আসবে সেই আমাদের স্বজন। বামুনরা এগিয়ে এল। এখন তাদের পারিবারিক যাবতীয় কাজে কর্মে আমাদের নিমন্ত্রণ করে কুটম্ব হিসাবে। আমরা ডাকলে ছুটে আসে। আমরা ত বামুনদের কাছে এটাই চেয়েছিলাম।

মামা অসুস্থ হলেন। মৃত্যু শয্যায়। প্রায় প্রত্যহ সকালে গিয়ে তাঁর শিয়রের কাছে খানিক বসে থাকতাম। মামা তখন শোনাতেন, ব্রাহ্মণকে যে সম্মান করি, বর্ণশ্রেষ্ঠ বলি—সেটা অকারণ নয়। শিক্ষা দীক্ষা কত ভাল। বউমাই তার প্রমাণ। সংসার মাথায় করে রেখেছে। আমার কী সেবা যত্নই না করছে। ব্যাজার ভাব নেই। সব হাসি মুখে করে।

মামার মৃত্যু হল। তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে গিয়ে দেখা গেল বৈদিক মতে কাজ হচ্ছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ করছেন।

মাতুল পুত্র সামনে আসনে উপবিষ্ট। তার শ্বশুর অর্থাৎ মামার ব্রাহ্মণ বৈবাহিক অনাবৃত দেহে গলায় উপবীত ঝুলিয়ে শ্রাদ্ধ কর্ম তদারক করছেন। মাতুল পুত্র হাতে পিণ্ড তুলে নিয়েছে পিতৃ প্রেতাত্মাকে দেবার জন্য। শ্বশুর দেখিয়ে দিচ্ছেন, কেমন করে হাত গলিয়ে সেটা নামিয়ে

দিতে হবে।

মামীমাকে বললাম, পিণ্ডদান হল। মহাপ্রভুর ভোগ হল না? মামীমা মুখে আঙুল চাপা দিয়ে চুপ করতে বললেন। তারপর বললেন, ঘরে বামুনের মেয়ে। তার বাবাই সব ব্যবস্থা করেছে। ছেলে বলছে, এটাই ভাল। আমরা আর বোষ্টম থাকব না।

হাসলাম। আর্যকরণের এও ত এক প্রক্রিয়া।

কিন্তু জয়ন্তীর মা প্রতিবাদিনী। বিধবা প্রৌঢ়া মহিলা, আত্মীয়া, নিমন্ত্রিতা। তিনি এলেন, খানিক বসলেন, সব দেখলেন, শুনলেন। তারপর উঠে চলে যেতে উদ্যত হতেই মামীমা তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। কী হলো, চলে যাচ্ছেন যে?

কী করব? আপনাদের বাড়িতে শ্রাদ্ধ হচ্ছে বামুন দিয়ে, পিণ্ডদান হচ্ছে। বৈষ্ণবদের ওসব দেখতে নেই। সেখানে থাকতে নেই।

তিনি বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। মামীমা অসহায়, বিব্রত, বিমূঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

জাত বৈষ্ণব সমাজ এখন এই সামাজিক সংকট ও সংঘাতের মধ্যে উপনীত।

জয়ন্তীর মার দলই সংখ্যাগুরু। দেশময় লক্ষ লক্ষ জাত বৈষ্ণব নিজেদের আচার বিচার ও বিশ্বাস নিয়ে জীবন যাপন করে চলেছে। অন্যদিকে ভাঙনের রূপ। সংখ্যালঘু হলেও তারা নগরবাসী ও শিক্ষিত সমাজ। দুই-এ মিলেই বর্তমান জাত বৈষ্ণব সমাজ মানস। এবং তাদের বর্তমান অবস্থান।

এখন স্বাধীন দেশ। জাতীয় সরকার। মানব কল্যাণ বা সমাজ কল্যাণের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে। সে সব লক্ষণীয়।

১। অস্পৃশ্যতা আইন বিরুদ্ধ।

২। জাতপাত সম্প্রদায় ভেদাভেদ মানসিকতার বিরুদ্ধে সরকার প্রচার রত।

৩। রেজেষ্ট্রি বিবাহ প্রথার প্রচলন। মালা চন্দনের বিয়ের চেয়েও সরল ব্যবস্থা। বর কনে সাজতে হয় না। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে, সাবালক সাবালিকা হলেই বিবাহ-যোগ্য। কন্যা-কুমারী, বিধবা, ডিভোর্সী—যা-ই হোক।

৪। গর্ভপাত আইন সিদ্ধ। বৈষ্ণবীর সাহায্য প্রয়োজন নেই আর। নিন্দনীয়ও নয়।

৫। জারজদের জন্য, অনাথ পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য স্থাপিত হচ্ছে শিশু মঙ্গল আশ্রম।

৬। বিপন্ন অসহায় নারীদের জন্য হচ্ছে উদ্ধারাশ্রম, অনাথাশ্রম, নারী কল্যাণ আশ্রম।

৭। যারা অসহায়, আর্থসামাজিক কারণেই ভিক্ষা বৃত্তি ছাড়া যাদের গতি নেই, তাদের জন্য খোলা হয়েছে সরকারি খয়রাতি সাহায্য ভাণ্ডার। সরকারই ভিক্ষা দেবে তাদের।

বলতে হয়, জাত বৈষ্ণবের সমস্ত সামাজিক ভূমিকাকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সরকারই যেন আজ জাত বৈষ্ণবে পরিণত।

জাত বৈষ্ণব সমাজকে যে সব কারণে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তার অনেক কর্মসূচীই সরকার কর্তৃক গৃহীত। জাত-বৈষ্ণব সমাজের সার্থকতা বোধহয় এখানেই।

আজ আর তার থাকার প্রয়োজনই বা কী?

তবু থাকবে সমাজের প্রয়োজনেই। সমাজের প্রয়োজন যতকাল না ফুরাবে। বহে চলবে আপন খাতে। তাদের গোত্র—অচ্যুতানন্দ। তারা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমতার দাবিদার। দৈনিক পত্রিকার পাত্রপাত্রী বিভাগ এবং পদবী পরিবর্তন বিভাগে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন লক্ষ করলেই তা অনুমান করা যাবে। নিচে কয়েকটি বিজ্ঞাপনের নমুনা দেওয়া হল:

পাত্রপাত্রী বিভাগ

১। **বর্তমান: ৩০, ৬, ১৯৯১**
পঃ বঃ বৈষ্ণব, পিতৃহীন গৌরবর্ণা ৩০/৫´।
সুশ্রী মধ্যম শিক্ষিতা প্রকৃত গৃহ কর্মে নিপুণা।
উপযুক্ত দাবীহীন পাত্র চাই। ব্রাহ্মণ চলিবে।

২। **বর্তমান: ২৮, ৭, ১৯৯১**
পঃ বঃ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ২৮/৫´-২´´
উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা গ্রাজুয়েট। ডি, পি, এড
সঙ্গীতজ্ঞা। সঃ চাকুরে উপযুক্ত পাত্র চাই।

৩। **বর্তমান: ২৮, ৭, ১৯৯১**

বৈষ্ণব পাত্র চাই

পাত্রী ২৬ (৫´-২´´) অচ্যুতানন্দ গোত্র।
সুশ্রী S. F. পাশ। উপযুক্ত পাত্র চাই।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সমতার দাবিদার শুধু পূজার্চনার ক্ষেত্রেই নয়, তা প্রসারিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও। গোপনে নয়, প্রকাশ্যেই।

পদবী পরিবর্তন

১। **বর্তমান : ২২, ৮, ১৯৯১**

আমি শ্রীবিশ্বনাথ দাস বর্ধমান কোর্টে ১৪।৮।৯১ তাং ১২৩৬২ নং এফিডেভিট বলে শ্রীবিশ্বনাথ অধিকারী হইলাম।

২। **বর্তমান : ৩০, ৮, ১৯৯১**

আমি মথুর অধিকারী গত ৯-৪-৯১ হাওড়া কোর্টে এফিডেভিট বলে পরিবারের সকলেই অধিকারী হইতে গোস্বামী পদবীতে পরিচিত হইলাম।

৩। **আনন্দবাজার পত্রিকা : ২৬, ৮ আগস্ট ১৯৯১**

I, Tapan Kumar Mahanta, along with my family members have changed our surname to Goswami, vide affidavit dated 14. 8. 91 at Bankura Court.

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন অর্থাৎ মথুর অধিকারী মশায় বৈষ্ণব অথবা মূলেই ব্রাহ্মণ কিনা বলা মুস্কিল। বৈষ্ণব হিসাবেই অনুমান করা হল।

পদবী পরিবর্তন একালে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দ নির্ভর। তাই ব্যক্তি এখানে আলোচ্য নয়। সামাজিক প্রবণতার বিচারই উদ্দেশ্য। এই প্রবণতা বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই আমার বক্তব্যের সমাপ্তি টানছি।

বিহারের পাটনায় আত্মীয় বাড়িতে আছি। একদিন এক দম্পতি এলেন আমার আত্মীয়দের কাছে, নিমন্ত্রণ পত্র হাতে নিয়ে। ছেলের উপনয়ন হবে, তাই নিমন্ত্রণ।

গৃহকর্ত্রী বললেন, ছেলের বয়স কত হল ?

আগন্তুক মহিলা বললেন, এই দশ বছর হল। এটাই পৈতে দেবার ঠিক বয়স। তা ছাড়া কী জানেন, কাকীমা, বামুনের ছেলে, পৈতে ত দিতেই হবে, যত তাড়াতাড়ি এসব কাজ চুকিয়ে দেওয়া যায়। ঝাড়া হাত পা। তাই বললাম, যা হোক করে কাজটা সেরে ফেল। এরপর ধানাই পানাই অনেক কথাবার্তা বলার পর বিদায় নেবার আগে মহিলা বললেন, কাকীমা, কার্ডে একটা ভুল ছাপা হয়েছে।

কী ভুল ?

পদবীটা অধিকারী ছাপা হয়েছে।

গৃহকর্ত্রী বললেন, তোমরা অধিকারী নও ?

না, কাকীমা। আমরা সর্বাধিকারী।

কিন্তু তোমরাই ত অধিকারী বলো।

হ্যা। ওঁকে বললাম, নামটা ছাপা যখন হচ্ছে, তখন সর্বাধিকারী লিখে দাও। সবাই জানুক। কিন্তু উনি বললেন, সবাই জানে অধিকারী। ওটাই থাক। বুঝল না আমার কথা। অধিকারী ত কত রকম হয়। সর্বাধিকারী হলে পরিষ্কার হয়ে যেত।

ওঁরা চলে যেতেই গৃহকর্ত্রী বললেন, কী কাণ্ড। ওরা আসলে আমাদের স্বজাতীয়। হাওড়ার গ্রামে বাড়ি। দাস পদবীই ছিল। এখানে এসে অধিকারী হয়েছে। বামুন বলছে, ছেলের পৈতে নিয়ে ঘটা করছে।

ওরা জাত বৈষ্ণব ? কী ভাবে জানা গেল ?

ওর মাসতুতো ভাই থাকে এখানে। তার পদবী দাস। সে বলে আমরা বৈষ্ণব। তার কাছেই সব শুনেছি। আবার ওদের গ্রামের একটি ছেলেও আছে। সেও বলে। এখন ওরা এসব বলছে! কী বলব ?

বললাম, বলার এই যে মহিলা যে ব্রাহ্মণ নয় তা বোঝা গেল। কারণ সর্বাধিকারী পদবীও ব্রাহ্মণের এক-চেটিয়া নয়। আর এখন পদবী কোন সম্প্রদায়গত যথার্থ ঠিকানাই নয়।

সূত্রনির্দেশ :

২৮। রমাকান্ত চক্রবর্তী : বারো মাস—এপ্রিল ১৯৮৬
সাহায্যকারী পুস্তক :
Ramakanta Chakravarty :
Vaisnavism in Bengal

একটি সাংবাদিক সুলভ নির্ভার বিবরণী

অরবিন্দ পোদ্দার

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কম্যুনিস্ট আন্দোলন যদিও আজ অতিশয় স্তিমিত এবং কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র বলে পরিচিত প্রাক্তন সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলো অবলুপ্ত, তথাপি সাম্যবাদী আদর্শ মৃত্যুহীন। রাষ্ট্রিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক শাসন-শোষণ ও অসমতা দূর করে ঐ তত্ত্বই এক মহামানবিক বিশ্ব-নির্মাণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, ভবিষ্যতেও করবে। সেজন্য, ভারতের মাটিতে, বিশেষত অবিভক্ত বঙ্গদেশে, সাম্যবাদী আন্দোলন কী ভাবে, কাদের প্রেরণায় ও সংগ্রামী কর্মোদ্যোগে দানা বেঁধে উঠেছিল তা জানার আগ্রহ স্বাভাবিক, তা নিয়ে গবেষণা এবং এর ইতিহাস রচনার দায়িত্বশীলতা তেমনি অভিনন্দনযোগ্য। এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের অনেকে, যাঁরা সহযাত্রীরূপে পার্শ্ব-চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা, এবং যাঁরা নিছকই কৌতূহলী দর্শক রূপে এই আন্দোলনের অনুগমন করেছিলেন তাঁরাও কেউ কেউ, এই কাহিনী উন্মোচন করেছেন। বলা বাহুল্য, বর্তমান কালের পাঠক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত ইতিহাস পাঠ করে লাভবান হয়েছে, আরও কী হতে পারত সে চিন্তায় হয়েছে মগ্ন।

অধ্যাপক অমিতাভ চন্দ্র অনেক দিন ধরে এই সূচনা পর্বের ইতিহাস আলোচনায় ও গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন। বর্তমান সংকলনের অন্তর্গত এগারটি প্রবন্ধ তাঁর শ্রম ও অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য বহন করছে। উল্লেখ্য যে, সব কটি প্রবন্ধই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, অন্য গ্রন্থে সংকলিতও হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাম্যবাদী চিন্তাধারা কীভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, এবং সমাজসচেতন ও রাজনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বাঙালি ইংরেজি-শিক্ষিত তরুণরা কী উন্মাদনায় সেই আদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন, তার একটি একাগ্র রূপরেখা এই গ্রন্থে লাভ করা যায়। সাম্যরাজ পার্টি, ইণ্ডিয়ান প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনারী পার্টি ইত্যাদি ক্ষীণজীবী রাজনৈতিক সংগঠন, যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু রাজনৈতিক কর্মী সচেতন নয়, সম্পর্কে তথ্যাদি লেখক পরিবেশন করেছেন। তাছাড়াও আছে বেঙ্গল লেবার পার্টি—পরে বলশেভিক পার্টি ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে মত-বিরোধ অন্তর্দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক নীতিগত আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের বিবরণ। সরকারি দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে এবং বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এসব তথ্যসংগ্রহ ও যথাযথভাবে তা সন্নিবেশ করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

তথাপি, এই সংকলনটি, সূত্রনির্দেশের উৎসাহব্যঞ্জক বাহুল্য সত্ত্বেও, গবেষণা-গ্রন্থের মর্যাদা অর্জন করেছে—এ অভিমত মেনে নেওয়া কঠিন। এর প্রধান কারণ, এই আন্দোলনের তত্ত্বগত বিষয় সম্পর্কে লেখকের অনাগ্রহ, এবং সেজন্যই নিছক বিবরণের উপর নির্ভরশীল হওয়া। প্রসঙ্গটি ঈষৎ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক। জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজম-এ উত্তরণ-এর প্রসঙ্গটিকে তাত্ত্বিক কাঠামোতে স্থাপন করে যদি আলোচনা করা যায়, তাহলে অনিবার্যভাবেই আলোচনা তত্ত্ব-গভীরতা অর্জন করত। ঐ আলোচনায় জাতীয়তাবাদের গুণগত বৈশিষ্ট্য কী, একজন জাতীয় বিপ্লবীর চরিত্র কী কী উপাদানে গঠিত, জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এই আদর্শের সম্পর্ক কী, ইত্যাদি সমস্যা পর্যালোচনা করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের মৌল স্ট্র্যাটেজি বিশ্লেষণ করা যেত। অমিতাভবাবু জাতীয় বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ তো স্ট্র্যাটেজি নয়, ট্যাক্‌টিক্স মাত্র। স্ট্র্যাটেজি হলো সশস্ত্র সংগ্রামের পথে সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত করা—এই লক্ষ্যে সফলতা অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত সন্ত্রাস, এই ট্যাক্‌টিক্সের অবদান কী, তা আলোচনা করার অবকাশ ছিল। কিন্তু করা হয়নি। তেমনি, জীবন-দর্শন হিসাবে কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্য কী কী জাতীয় বিপ্লবীরা নিজ নিজ জীবনে কতখানি তা গ্রহণ করেছিলেন, অথবা তাঁদের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যে গুণগত রূপান্তর আদৌ ঘটেছিল কিনা, এসব বিষয়ে আলোকপাত এই গ্রন্থে প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু কেন যে এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে লেখকের অনীহা তা বুঝে ওঠা কঠিন। জাতীয় বিপ্লবী কর্মপন্থা বর্জন করে সাম্যবাদী আদর্শ গ্রহণ করেন—এ ধরনের

অতিশয় সরল রেখাময় উক্তি একটা ব্যাপক গণমুখী আন্দোলনকে উপলব্ধি করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

অন্য দিকে, মস্কো থেকে ফিরে আসার পর গোপেন চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতির সাংগঠনিক রূপান্তর সাধনের জন্য নেতৃবৃন্দের বিবেচনার জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। তাতে ছাত্রদের মধ্যে, শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকে, কী ভাবে কোন পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে, তা যেমন বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, তেমনি সেনাবাহিনীর মধ্যে (সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় করার দাবিতে) কীভাবে প্রচার চালাতে হবে, এবং জাভা, পারস্য, চীনে অবস্থিত সোভিয়েট কনসালের মাধ্যমে মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ও তাঁদের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থাপনার কথাও ছিল। অনুমান করি, সরকারি দলিল দস্তাবেজ অনুসন্ধান করার অধ্যাপক চন্দ্র এ তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন; কিন্তু গ্রন্থে তার কোন ব্যবহার লক্ষ করলাম না। করলে ধরণী গোস্বামী-গোপেন চক্রবর্তী গোষ্ঠীর তৎকালীন মানসিকতার পরিচয়ে তাঁর বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে গভীরতা অর্জন করত।

আরও একটি গুরুতর বিষয় গ্রন্থের আলোচনার স্থান পাওয়া উচিত ছিল। সেটি এই, সাম্যবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে যাঁরা ভারতবর্ষের এবং এ দেশের জনসমষ্টির নতুন জীবনের ভিত্তি সৃষ্টি করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাস, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে কতটা অবহিত ছিলেন সে জিজ্ঞাসা খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ, একমাত্র ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া আর কেউ, ঐ পর্বে, এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন বলে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। অথচ, এ ত বিতর্কের বিষয় নয়, সম্পূর্ণ তত্ত্বগত আধিপত্য ছাড়া কোন জিনিসকেই বদলানো যায় না। জলকে যদি বাঁধতে হয় ত জলপ্রবাহের নিয়ম জানা একান্ত প্রয়োজন; তেমনি, সমাজ-ব্যবস্থাকে যদি আমূল বদলাতে হয় ত তার গতিবিধিও আয়ত্ত করতে হয়—সকলকে এক এবং সমান করে দেব, এই সদর্প ঘোষণাটা কার্যক্ষেত্রে যথেষ্ট বিবেচিত হয় না। আসল কথা, আদি পর্বের কমিউনিস্ট চিন্তাবীররা ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজব্যবস্থা, ইত্যাদিকে কী ভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং কী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তার কোন হদিস অমিতাভবাবু পেয়েছিলেন কি? পেয়ে থাকলে তা উদ্ধার করলে ভাল হত। এ কথার উল্লেখ করা হচ্ছে এ কারণে যে, অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ-প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাঁরা গড়ে উঠেছেন, তাঁরা কম্যুনিস্ট হলেও মানসজীবনে প্রবাসী এবং আত্মপরিচয়ে দীন। পাশ্চাত্য দুনিয়া তাঁদের মানস পরিমণ্ডল যতখানি আচ্ছন্ন করে রয়েছে, ভারতবর্ষের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের ততখানিই অভাব। সেজন্য কমিউনিস্ট বলে পরিচিত ব্যক্তিরা পশ্চিমবাংলা শাসন করলেও প্রতি বছর তাঁদের "হোম"-এ পাড়ি দিতে হয়, অবসর যাপনের জন্য। সূচনা পর্বের গুরুরা যদি এ বিষয়ে সতর্ক থাকতেন তাহলে এই প্রেমহীন পরিণতি সম্ভবত রোধ করা যেত।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার হল, আলোচ্য ইতিহাসের সময়সীমা যদিও ১৯৪৫ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত, তথাপি "জনযুদ্ধ" পর্যায়ের কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। পার্টির তখনকার "লাইন" সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা নিতান্ত পরোক্ষভাবে, যেমন বলশেভিক পার্টির নীতির পর্যালোচনার মাধ্যমে। অথচ, ১৯৪১এর মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৪৫ সনের মধ্যে পার্টির সংগঠন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে, সর্বভারতীয় চরিত্র ও গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করে, সদস্য সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়, জনসংযোগ ঘটে অপ্রত্যাশিত—অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসন কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কেন লেখক বর্জন করলেন সে বিষয়ে মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে। সত্য কি এই যে, সরকারি দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে এমন কোন তথ্যের সন্ধান তিনি লাভ করেছেন যা পরিবেশিত হলে পার্টি ও পার্টি-নেতৃত্ব কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হতেন? এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হয়, একজন গবেষকের নিকট যে সততা প্রত্যাশিত এক্ষেত্রে তার অভাব ঘটেছে। সূচনা পর্বের কম্যুনিস্ট নেতাদের প্রতি লেখক অতিশয় শ্রদ্ধাশীল—বইখানা তাঁদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু শ্রদ্ধা অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যপ্রকাশের পথ অবরোধ করবে, এটাও ত কাম্য নয়।

লেখকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় দিক হল, তিনি বহু সংখ্যক প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। তিনি নিজেই অবশ্য স্বীকার করেছেন, ঐভাবে প্রাপ্ত তথ্য প্রামাণ্য ইতিহাস নয়। নয় যে তার নজির ঐ গ্রন্থেই রয়েছে, একই ঘটনা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য। এ সম্পর্কে মনে রাখা প্রয়োজন সে সময়ে গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, পারস্পরিক অবিশ্বাস, ইত্যাদি ছিল খুবই

প্রবল (এখন যে নেই তা নয়)। প্রতিটি গোষ্ঠীই ভাবত, ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাঁরাই হবেন একচ্ছত্র নায়ক, অন্য কারও সে বিপ্লব সংগঠনের কোন অধিকার নেই। এই মনোভঙ্গি থেকে জন্ম নেয় অপ্রিয় সমালোচনা, কুৎসা, ইত্যাদি। আর দেখা দেয় চমকে দেবার মত কিছু একটা করে দৃষ্টি আকর্ষণ করার—নইলে সাম্যরাজ পার্টির (মাত্র চার-পাঁচ জন সদস্য নিয়ে গঠিত) সব সদস্য লাল জামাকাপড় লাল জুতো পরে একটা সম্মিলনে উপস্থিত হয়ে হাঙ্গকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবেন কেন? ঐ লাল আভরণ শক্তির নয়, শক্তিহীন উচ্ছ্বাসের পরিচায়ক। ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছাড়াও বয়স বিস্মৃতি ঘটায়, ঘটনার সত্যাসত্য, পারম্পর্য ইত্যাদি নষ্ট হয়। আবার ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত অহং সংগোপনে ক্রিয়াশীল থাকে, এবং মূল্যায়নে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। ব্যক্তিগত অহং অগোচরে কী ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে আলোচ্য গ্রন্থ থেকেই তার ছোট্ট একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর আত্মকথার শিরোনাম দিয়েছেন "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি"; এই নামকরণে "আমার জীবন" অগ্রাধিকার পাওয়ায় এর ইঙ্গিত দাঁড়ায়—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে "আমার জীবন" অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অহং চেতনা এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল কিন্তু সরোজ মুখোপাধ্যায়ের আত্মকাহিনীর শিরোনামে "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা" ঐ চেতনা অনুপস্থিতি।

লেখকের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা সম্পর্কে অসংখ্য খুচরো অভিযোগ উত্থাপন করা যায়, সব কটির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মাত্র দু-একটির উল্লেখ থেকেই অনুগুলোর আভাস পাওয়া যাবে। ১৯০৮ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে "নেতৃত্ব-প্রদানের সঠিক ঐতিহাসিক কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হওয়ার" জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা করা হয়েছে, অথচ পরের পৃষ্ঠায়ই পার্টির সংগঠনকে "শিশু" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন, যে সংগঠন শিশু তার পক্ষে গণ-আন্দোলনে নেতৃত্বদান কী করে সম্ভবপর ছিল? লেখকের মতে, ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ এর মধ্যে পার্টির "সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও জনসাধারণের চোখে মর্যাদাবৃদ্ধি উভয়ই ঘটে" (পৃ.২৭) অথচ তাঁর দেওয়া তথ্য থেকেই জানা যায়, ১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে পার্টি বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। বেআইনী পার্টির পক্ষে প্রকাশ্য জনসংযোগমূলক কাজকর্ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর ছিল না। সেই সংযোগের অভাবে জনসাধারণের চোখে মর্যাদাবৃদ্ধির কথাটা কি অযৌক্তিক বলে মনে হয় না? এগুলো অসতর্কতার পরিচয় বহন করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, অধ্যাপক চন্দ্র তত্ত্বগত কাঠামো নির্মাণ করেননি বলে আলোচনা কোন পর্যায়েই গভীরতা অর্জন করেনি; সেজন্য, এ সিদ্ধান্তেই স্থিত হতে হয়, গবেষণার পরিচয় বহন করলেও এটি নিছক সাংবাদিক সুলভ নির্ভার বিবরণ মাত্র।

অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন, সূচনা পর্ব—অমিতাভ চন্দ্র / পুস্তক বিপণি / পঞ্চাশ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের কোণঠাসা শ্রমিক আন্দোলন এবং ভোটরঙ্গ প্রসঙ্গ

পুলক নারায়ণ ধর

পশ্চিমবঙ্গের রুগ্ন শিল্প ও শ্রমিকদের দুর্দশার কারণ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্ব পালনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নাগরিক মঞ্চ'। 'নাগরিক মঞ্চ' সমান্তরাল ট্রেড ইউনিয়ন নয়। এটি একটি তথ্যানুসন্ধানী সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যের প্রতি এদের পূর্ণ আস্থা নেই। কারণ শ্রমিকদের আর্থিক রোজগার বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃত রোজগার কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে সেই হিসেব সরকারি দলিলে মেলে না। তাই স্বাধীনভাবে নানা উৎস থেকে ও নানাস্থানে ঘোরাঘুরি করে যেসব তথ্য এই মঞ্চের গবেষকরা সংগ্রহ করেছেন তার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের বাস্তব চিত্রটি তাঁরা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

মাত্র সত্তর পৃষ্ঠার আলোচ্য পুস্তিকাটি পশ্চিমবঙ্গের পাট-শিল্প ও বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা (বা দুরবস্থা) সম্পর্কে আলোকপাত করেছে।

১৯৮১ সালের আদম সুমারির ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট শ্রমিক সংখ্যা ১৫০·২৪ লক্ষ। এ ছাড়াও আছে ১০·৪০

লক্ষ প্রান্তিক শ্রমিক (marginal workers)। প্রায় ১১৯ লক্ষ শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (secondary) উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। সংগঠিত মজুরি অর্জনকারী শ্রমিকদের সংখ্যা শতকরা হিসাবে মাত্র ১·৬৪ ভাগ। সংখ্যানুপাতে অকিঞ্চিৎকর হলেও সাংগঠনিক ও গুণগত বিচারে এরা কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী।

পাঁচের দশক থেকে অর্থাৎ ১৯৫১ সাল থেকে ছয়ের দশকের গোড়া পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের চেহারা কেমন ছিল? বছরে ১৬·৩ হাজার শ্রমিক বেড়েছে। কিন্তু ১৯৬৫ থেকে ১৯৯২-এর মধ্যে (তীব্র গণ আন্দোলনের বছরগুলি) প্রতি বছর ২২ হাজার শ্রমিক কমেছে। কর্মে নিযুক্তির সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। জনসংখ্যা বেড়েছে প্রতি বছরে ৮·৫০ লক্ষ।

১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত একটি হিসাবে দেখছি মজুরি স্তরের অবনতি অব্যাহত আছে। হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮৮ সালের মজুরি স্তর ১৯৮৬তেও অপরিবর্তিত আছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৯৮৫ সালে মোট যে শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে তার ১·৩% ছিল শ্রমিক ধর্মঘটের জন্য এবং ৯৮·৭% নষ্ট হয়েছে লকআউট ইত্যাদির জন্য। ১৯৮০র পর বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে শ্রমিকদের দাবি আদায় করার ক্ষমতা অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৯তে শ্রমিকরা যে মজুরি পেতেন তার প্রকৃত মূল্য ১৯৮৫-৮৬তে প্রায় ১১% হ্রাস পেলেও শ্রমিকরা বাম শাসিত রাজ্যে কোন অশান্তির কারণ হন নি। এটা রাজ্যের গৌরব চিহ্ন হলেও শ্রমিক আন্দোলনের সাবেকি কুলতিলক নয়।

বর্তমানে চল্লিশ হাজারেরও বেশি কলকারখানা রুগ্ন-শিল্পের তকমা বহন করছে। এ সম্বন্ধে শুকনো তথ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "লেবর ইন্ ওয়েস্টবেঙ্গল" পুস্তিকায় পাওয়া যাবে। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের অবর্ণনীয় অবস্থা ও দুঃখকষ্টের মানবিক চিত্র তে এখানে পাওয়া যাবে না। বিভিন্ন বন্ধ কলকারখানার বেকার শ্রমিকদের মানবিক জীবনের তথ্য ও ছবি নাগরিক মঞ্চের সংবেদনশীল গবেষকদের এই পুস্তিকাটিতে পাওয়া যাবে। শিল্পের রুগ্নতার জন্য কলকারখানার লৌহ কপাট বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকদের কালো মুখগুলো কোথায় হারিয়ে যায় তার খবর কে রাখে? নাগরিক মঞ্চের গবেষকদের ধন্যবাদ। তাঁরা এই হারিয়ে যাওয়া শ্রমিকদের খুঁজে বের করে তাদের বর্তমান করুণ অবস্থার কথা আমাদের জানিয়েছেন।

পাটশিল্পের রুগ্নতা সম্পর্কে এই পুস্তিকায় গবেষকরা কিন্তু প্রচলিত ধারণার বিপরীত চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে বাঙলাদেশের উৎকৃষ্ট পাটের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে বর্ধিত হলেও দেশের অভ্যন্তরিক বাজারে এখন একটু তেজী ভাব লক্ষণীয়। ১৯৮৫-৮৬ সালে অভ্যন্তরিক বাজার ১,০৯,২৭,০০০ টন পাট ব্যবহার করেছে। ১৯৮৯-৯০ সালে তা ৬০০০ টন বৃদ্ধি পায়। এই হিসেব কিন্তু পাট শিল্পের তেজী ভাবের কোন গ্যারান্টিই নয়। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৫ সালে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য পরিবহনের জন্য চটের থলি ব্যবহার আবশ্যিক করেছেন। নুন, চিনি, সিমেন্টের ক্ষেত্রে এই থলি ব্যবহার বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রসঙ্ঘও অনুরূপ অনুরোধ করেছে। এইসব কারণে পাটের অভ্যন্তরিক বাজার ঊর্ধ্বগামী। সাম্প্রতিক উপসাগরীয় যুদ্ধও পাটের চাহিদা কিছুটা বাড়িয়েছে। এইসব ঘটনা ও উপাদান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল নয়। (With the assured domestic market and a prospective export front, the future of the industry does not look bleak at all). পৃঃ ৩২

বাস্তব অবস্থা অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও পাট শিল্প ও পাট শ্রমিকদের দুর্দশার কোন লাঘব ঘটেনি। কেন? নাগরিক মঞ্চের মতে এর ঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া মুস্কিল ("it seems inexplicable")। এই সমস্যা কারখানার মালিকদের, অর্থাৎ যারা অনেকেই ফাটকাবাজ (speculator) তাদের, অতিরিক্ত লোভাতুর মানসিকতা। এই সব মিল-মালিক তথা পাট ব্যবসায়ীরা মিলের অর্থ কারখানার উন্নতিতে না লাগিয়ে কাঁচাপাট কেনাবেচা ও অন্যান্য ব্যবসায় নিয়োগ করে। এই প্রক্রিয়ায় তারা পাট শিল্পের ধ্বংস সাধন করছে। ও বিপুল পরিমাণ কালো টাকার প্রবাহ সৃষ্টি করছে।

কিন্তু মালিক পক্ষের শোষণ প্রবৃত্তি ও কালো টাকা উপার্জনের প্রচেষ্টাই কি পাটশিল্পের ধ্বংসের কারণ? পুরনো পদ্ধতিতে উৎপাদন ক্রিয়া ও গতানুগতিক চিন্তা-ভাবনা কি এই শিল্পের ক্ষতি সাধন করছে না? এই শিল্পের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলি ও তার ক্রমহ্রাসমান চাহিদা পাট শিল্পকে কতখানি দুর্বল করে তুলেছে তার ওপর বিশেষ জোর গবেষকরা দেন নি।

নানা ধরনের সরকারি সাহায্য ও আইন কি এটাই

প্রমাণ করে না যে এই শিল্পের নিজের কোমরের জোর কমে গেছে? এক বিপুল কলেবর শ্রমিক বাহিনী ও মুষ্টিমেয় মালিককে টিকিয়ে রাখতে বা রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই কি সরকার তার শাসন ক্ষমতা বলে পাটশিল্পের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করছেন না? আরও একটি প্রশ্ন যা আমরা সচরাচর আলোচনা করতে দ্বিধাবোধ করি তা হচ্ছে ধান্দাবাজ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও চতুর মালিকপক্ষের সমঝোতা।

এই দুই গোষ্ঠীর সমকামিত্ব পাটচাষী ও পাটশিল্পের সহমরণের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছে। অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্পের ধর্মঘট ও নব্বই টাকা (পাঁচশ পঞ্চাশ টাকা দাবি তুলে) মাইনে বৃদ্ধি পরিসমাপ্তিতে যে যে ইতিহাস লেখা হল তার তুলনা যে নিজেই! 'নাগরিক মঞ্চ' যদি বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকার ওপর তথ্যানুসন্ধান করেন তবে শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চরিত্রের প্রকৃত চিত্র আমরা পেতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গের অধোগতি সম্পন্ন এই শিল্পের জন্য বা সামগ্রিক শ্রমিক কল্যাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে তেমন উতলা নন সে অভিযোগও নাগরিক মঞ্চের আছে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে যে বিরল অঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারও বিনিয়োগ করছে তার প্রতিদান এত ক্ষীণ কেন? সবটাই কি সরকারের ঔদাসীন্য? আসলে বিপুল শ্রমিক বাহিনী ও অমিত শক্তিধর ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সরকারের তেমন বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। আজকাল একটা অভিযোগও শোনা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে কোন 'ওয়ার্ক কালচার' নেই। এই অভিযোগ কি একেবারেই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়? নাগরিক মঞ্চের অনুসন্ধান দৃষ্টিতে তা বিশেষ ধরা পড়ে নি।

বইটির মুদ্রণ, ভাষা ও সর্বোপরি সংবেদনশীল উপস্থাপনা প্রশংসনীয়। মাত্র সত্তর পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটিতে সাত'শ পৃষ্ঠার উপাদান ঠাসা আছে।

একটা সময় ছিল যখন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন সাধারণ মানুষের মনে একটা আলোড়ন তুলত। সরকার নড়েচড়ে বসত। কিন্তু আজ আর সেই চিত্র নেই। আজ আন্দোলন বলে কিছু নেই। আঞ্চলিক রাজনীতির মত সমস্যা ভিত্তিক বিচ্ছিন্ন আন্দোলন ও তার বিচ্ছিন্ন সমাধানই আজকের আন্দোলনের চরিত্র। চটকল শ্রমিকদের আন্দোলন ও জুতোর কারখানার শ্রমিক আন্দোলনের কোন যোগ নেই। মোটর কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের আন্দোলনের সম্পর্ক নেই। পশ্চিমবঙ্গে বাম-শাসিত সরকারই এদের একমাত্র যোগসূত্র। এবং কে না জানে যে সর্বকালের সর্বজাতের সরকারই চান বার বার ক্ষমতায় ফিরে আসতে। এই বার বার ক্ষমতায় ফিরে আসার কৌশল কিন্তু লুকিয়ে থাকে ভোটের অঙ্ক কষার দক্ষতায়। সুতরাং সকল আন্দোলন এই ভোটের অঙ্কের সূত্রে গাঁথা। আমরা সবাই এই ভোটে উৎসাহী। চটকল, জুতোকল, লেখাপড়ার কল সর্বত্রই ভোট সমান উত্তাপ সৃষ্টি করে। অনেকটা এক দিনের ক্রিকেট খেলার উত্তাপের মত। এই ভোট বড় রঙ্গ যাদু।

এই ভোটেরও একটা পূর্বাপর ইতিহাস আছে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত যত ভোট হয়েছে তার ইতিহাস ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রেরই ইতিহাস।

এই গণতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনীতির একটা বিশেষ চেহারা অনেকে ভোটের অঙ্কে ধরে রাখেন। সেই সংসদীয় ইতিহাসের বিবর্তনের ধারা ও ভোটের অঙ্কের একটা সুচারু হিসেব ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা দিলীপ ব্যানার্জী অনেক পরিশ্রম করে আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর নির্বাচনী নথি বা রেকর্ডারে। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বইটি প্রকাশিত হয়। এর পর আরও একটি নির্বাচন আমাদের দেশে ঘটে গিয়েছে। বইটি অবশ্য শুধু অবিভক্ত বাংলা ও বর্তমান পশ্চিম বাংলার নির্বাচন চিত্রই তুলে ধরেছে। কিন্তু তাতেও গ্রন্থটি বিপুল আকার ধারণ করেছে। প্রায় ৬৩০ পৃষ্ঠা।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভা ও পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা আসনে নির্বাচনের (১৯৮৪) সম্পূর্ণ ফলাফল সহ সমস্ত মন্ত্রীদের নামের তালিকা ছাড়াও অবিভক্ত বাংলার ১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে স্বাধীনোত্তর পশ্চিম বাংলার বিধানসভা সভ্যদের তালিকা, মন্ত্রীদের তালিকা, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকারের নামের তালিকা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতির তালিকা বইটির মূল্যবান অংশ। ১৮৫৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত লেঃ গবর্নর ও রাজ্যপাল কারা ছিলেন তারও একটি সুদীর্ঘ তালিকা অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন।

এই 'রেকর্ডার'-টিতে বিস্তারিত ভোটের অঙ্ক পাওয়া যাবে যা ভোটপ্রার্থী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষকদের কাছে

অপরিহার্য। বইটি এক কথায় বিপুল তথ্যের সমুদ্র। কোন বিশ্লেষণ বা মন্তব্য ছাড়াই তথ্যগুলি পরিবেশন করা হয়েছে। অনেকটা টেলিফোন ডাইরেকটরি-র মত অর্থাৎ যার যেমন প্রয়োজন তিনি সেই মত ব্যবহার করবেন। অঙ্ক আমাদের প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ভোটের অঙ্ক সব সময় বাস্তব রাজনীতির প্রকৃত প্রতিফলন ঘটায় না। ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন বা ইদানীং কালের কোন কোন নির্বাচন শুধু অঙ্ক দিয়ে বুঝতে গেলে গোল বেধে যাবে। গণতন্ত্র যে অনেকটাই কৃত্রিম বেণীর মত হয়ে উঠছে তা কী ভাবে বোঝা যাবে? পাঠক ও গবেষকদের জন্ম তা তুলে রেখেছেন সংকলক দিলীপ বাবু।

তথ্যের কথাই যদি শুধু ওঠে তবে মনে হয় ভারতের বা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন পর্বকে কেন্দ্র করে যে বিরাট টাকার অঙ্ক জড়িত সে সম্পর্কে কিছু তথ্য থাকলে ভারতীয় গণতন্ত্রের বহরটা বোঝার সুবিধা হত। একটু ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। বর্তমানে ৮৫ কোটি ভারতীয়র মধ্যে (সকলেই ভোটার নন) ১৯৮৯ সালে নির্বাচনে ৫৪৩ টি আসনের জন্ম প্রার্থী ছিলেন ২,৪৩৯ জন। পঞ্চাশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত নির্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনগুণ। ব্যয়ের দিকটার দিকে তাকালে দেখব ১৯৫২ সালে নির্বাচন নির্বাহের ব্যয় হয়েছিল ১০·৪৫ কোটি টাকা এবং ১৯৮৯তে ব্যয় হয়েছে ১১০·০০ কোটি টাকা। এর অনেক কম টাকায় সারা দেশের সমস্ত মানুষকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করে জীবন দান করা যেতে পারে। কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ধমনীতে রক্তপ্রবাহ অব্যাহত রাখার তাগিদে ঘন ঘন নির্বাচন ও তার বিপুল ব্যয় ত আমাদের মেনে নিতেই হবে।

এই ব্যয়ের ও বিভিন্ন দল ও প্রার্থীদের ব্যয়ের একটি সম্ভাব্য বাস্তব হিসেব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থাকা উচিত। এবং এই দায়িত্ব যদি নির্বাচন গবেষকরা বা তথ্যানুসন্ধানীরা ভবিষ্যতে তুলে নেন তবে মনে হয় তা সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি বাঙ্ময় হয়ে উঠবে। নির্বাচনের চিত্রটা অনেকটা খোলতাই হবে। কারণ, গ্রামসচির ভাষায়: "Events are the real dialectics of history."

পরিশেষে, অধ্যাপক হীরেন মুখার্জির প্রারম্ভিকতা গ্রন্থটির একটি সমৃদ্ধ অংশ। শুধু খটকা লাগে যখন হীরেন বাবুর মত বিদগ্ধ ও অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ সাংসদ আমাদের জানান ভারতীয় সংবিধান ১৯৫২ সালে জানুয়ারি মাসে কার্যকর হয়েছে (came into force)। প্রকৃত ভারতীয় সংবিধানের নির্বাচন সংক্রান্ত ও অন্যান্য কিছু অংশ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর থেকেই চালু হয়ে গিয়েছিল। বাকি অংশ ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে সচল হয়। প্রথম সাধারণ নির্বাচন অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে।

সব মিলিয়ে ভোটপর্বের এই সংকলনটি সুগ্রথিত মূল্যবান দলিল, যা প্রত্যেক পাঠাগারে সম্পদ হিসাবে সংগৃহীত হবার ন্যায্য দাবি রাখে।

Against The Wall—West Bengal Labour Scenario/Nagarik Mancha 134 Raja Rajendralal Mitra Rd Calcutta 85 Rs 40·00

Election Recorder—Book Front Publication Forum / AJ 162 Sector II Salt Lake, Calcutta 91 Rs 300·00

ধর্মান্ধতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত-বিভাজন—সে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বের কথা। কেবল কংগ্রেস ও লীগই নয়, তখনকার তাবৎ রাজনৈতিক দল এবং গান্ধীজী বাদশাহ খাঁদের মত বিরল সংখ্যক নেতার কথা বাদ দিলে রাজনীতির ক্ষেত্রে সে সময়ে সক্রিয় অধিকাংশ হিন্দু মুসলমান নেতা ও কর্মীরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে ভারত ভাগ হয়েছিল। সবার মনের কথা মোটামুটি এই ছিল যে অতঃপর এই বিবাদ-বিসংবাদ ও হানাহানির অবসান হবে এবং যে যার জায়গায় শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তা যে সম্ভব হয় নি ও ভারত-বিভাজন মাথা কেটে ফেলে মাথা ব্যথার চিকিৎসার মত হয়েছে (উপমাটা ভারত-বিভাজনের অন্যতম নায়ক পরবর্তীকালে অনুতপ্ত জওহরলালের), তা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। ভারত-পাকিস্তানের পারস্পারিক শোচনীয় সম্পর্কের কথা (আসলে যা স্বাধীনতাপূর্ব যুগের সাম্প্রদায়িক বিবাদের আধুনিক আন্তর্জাতিক রূপান্তর) যদি বাদও দেওয়া যায়, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক আদৌ হৃদ্যতামূলক নয়। (বিভ্রান্তি এড়াবার জন্ম এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে এই বিবাদ-সংঘাত জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকায়ত স্তরে নয়। তাঁদের মধ্যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সমন্বয়-প্রক্রিয়া মোটামুটি অব্যাহত। বিবাদ শিক্ষিত নেতৃস্থানীয়দের মহলে, যাঁরা সংখ্যালঘু হলেও মুখর বলে তাঁদের কণ্ঠ আর সবাইকে ছাপিয়ে শ্রুতিগোচর।) সংক্ষেপে দেশ ভাগ করেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়নি। সুতরাং সমস্যাটি সম্বন্ধে যে কোন দায়িত্বশীল নাগরিকেরই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই দিক থেকে সমালোচ্য গ্রন্থটি তাবৎ চিন্তাশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দাবি রাখে।

ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক ও সুলেখক অমলেন্দুবাবু মুক্ত মনের চিন্তক হিসাবে খ্যাতিসম্পন্ন। এই জটিল বিষয় সম্বন্ধে গত সাত বছরের মধ্যে তাঁর লেখা এই ছয়টি প্রবন্ধ (ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা, ভারতীয় জীবনে মুসলিম জনবিন্যাস, ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুসলিম সমাজ, মুসলিম লীগ রাজনীতি: কয়েকটি প্রশ্নের বিশ্লেষণ, ধর্মান্ধতাকে চালান হচ্ছে জাতীয়তার নামে এবং বাবরের ধর্মনিরপেক্ষতা) বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজক রূপে অভিনন্দিত হবে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মোটামুটি দুটি দিক আছে। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগেরও উপর হিন্দু হলেও মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য নয়—শতকরা এগার ভাগের উপরে। সংখ্যায় তাঁরা এগার কোটির মত। এই বিপুল সংখ্যক ভারতবাসীকে যদি আরব সাগরে ঠেলে ফেলে দেবার মত উন্মাদ পরিকল্পনা কারও না থাকে, তাহলে তাঁদের স্থান এদেশে কোথায়? সম্প্রতি যাঁরা "হিন্দুরাষ্ট্রের" প্রবক্তা, তাঁদের পুরোগামী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের এক কর্মধার গুরু গোলওয়ালকরের নিদানই কি তাঁদের বিধিলিপি? "The non-Hindu peoples in Hindusthan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of glorification of the Hindu race and culture, *i. e.* they must not only give up their attitude to intolerence and ungratefulness towards this land and its age-long traditions but must also cultivate the positive attitude of love and devotion instead—in a word they must cease to be foreigners, or may stay in this country wholly subordinated to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment—not even citizen's rights." (*We or our Nationhood Defined*-এর পৃ. ৫৫-৫৬ থেকে সমালোচ্য গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)। ভোটের রাজনীতির স্বার্থে "সঙ্ঘ পরিবার"-এর কোন কোন প্রতিষ্ঠান পূর্বোক্ত বক্তব্যকে কিছুটা শুতিনন্দন করার চেষ্টা করলেও নব্য হিন্দুত্ববাদীদের ভূমিকা একই থেকে গেছে।

এই বিপুল সংখ্যক দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিবাসীদের (এঁদের নাগরিকতাও থাকবে না নব্য হিন্দুত্ববাদীদের বিধান অনুসারে) নিয়ে কোন আধুনিক রাষ্ট্র কি শক্তিশালী ভাবে গড়ে উঠতে পারে? এবং শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য ইত্যাদির মধ্যে হিন্দুত্বের কোন্ ধারাটি সবার কাছে স্বীকৃত হবে, হরিজন তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের স্থান কোথায় এই নব্য হিন্দুত্বে এবং কেনই বা তাঁরা এই ব্যবস্থা মেনে নেবেন, শিখ, খ্রীস্টান (উত্তরপূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে এঁরা সংখ্যা গুরু) ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শীদের স্থান কোথায় হবে হিন্দুরাষ্ট্রে? এসব অস্বস্তিকর প্রশ্নের কেবল উত্থাপন করেই নব্য হিন্দুত্ববাদীদের ভূমিকার আলোচনা শেষ করা হবে।

অপর অর্থাৎ গোঁড়া মুসলিম পক্ষটিও সমান উৎকণ্ঠার কারণ। এর অন্যতম প্রবক্তা মৌলানা মওদুদীর মতে, "ইসলামের দৃষ্টিতে তারাই কেবল মুসলিম সম্প্রদায় যারা 'গয়ের ইলাহী' সরকার মিটিয়ে দিয়ে ইলাহী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের গড়া আইন-কানুনের পরিবর্তে খোদাই আইন-কানুন দ্বারা দেশ শাসনের জন্ম সংগ্রাম করে। যেদল বা বা জামায়াত এরূপ করেনা, বরং গয়ের ইলাহী শাসনব্যবস্থায় 'মুসলমান' নামক একটি সম্প্রদায়ের পার্থিব কল্যাণসাধনে সংগ্রাম করে, তারা ইসলামপন্থী নয় এবং তাদের মুসলিম সম্প্রদায় বলাও বৈধ নয়।" (সিয়াসী কাষমকাষ-এর তৃতীয় খণ্ডের ৯৪ পৃষ্ঠা থেকে সমালোচ্য গ্রন্থের ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) নব্য হিন্দুত্ববাদীদের মত ইসলামী মৌলবাদীরাও একাধিক মুখে তাঁদের কথা বলেন। দুই মুসলিম লীগ ছাড়াও এগুলি হল তামির-ই-মিল্লাত, মুসলিম মজলিশ-ই-মুশাওয়ারত, মুসলিম মজলিশ, মজলিশ-ই-ইত্তেহাদুল মুলেমিন এবং কেরলের

সাম্প্রতিক (১৯৯২ খ্রি) দাঙ্গাসমূহের অন্যতম নায়ক ইসলামিক সেবক সঙ্ঘ ইত্যাদি হল সেই সব মুখ। এইসব সব সংস্থা ইসলামিক রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রচার করে। তারা এই কথাও বলে, 'ভারতে ইসলাম বিপন্ন।' ১৯৬২ খ্রি পর্যন্ত 'জমাত-ই-ইসলামী' সংস্থা 'হুকুমত-ই-ইলাহিয়া'-কে তাদের উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করে। তারপর এই সংস্থা আন্দোলনের কৌশল পরিবর্তন করে ঘোষণা করে 'দ্বীন' প্রতিষ্ঠা করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একটি 'জীবন ব্যবস্থা' যা হবে 'ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সমগ্র সমাজের ব্যবস্থা'। এই ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করে মৌলানা মওদুদী বলেন : "খোদার নিকট ইসলামই একমাত্র প্রকৃত বিশুদ্ধ ও নির্ভুল জীবন-ব্যবস্থা বা চিন্তা ও কর্মের প্রণালী। এই কথাও বলা হল : ভারতে মুসলমানরা ক্রমশঃ 'ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে'; 'রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা' করলেই এই অবস্থা থেকে দ্রুত পরিত্রাণ সম্ভব। তাই মুসলিম রাজনীতিকে একটি স্বতন্ত্র পথে বইয়ে দেবার প্রয়াস চলে" (পৃ ৭)।

ইংরেজের এদেশে জাঁকিয়ে বসার পর থেকেই মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় (আবার বলি সংখ্যাগুরু সাধারণ মুসলমান নন, লোকায়ত স্তরে প্রাকৃতিক বিধানে যাঁরা ঐ স্তরের হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশে ভারতীয়ত্বের আধার এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন) এক অস্তিত্বার দ্বন্দ্বে ভুগছেন। তাঁরা মুসলিম ভারতীয় (সৈয়দ শাহবুদ্দীন ও তাঁর মত নেতাদের বর্তমান ভূমিকা), না ভারতীয় মুসলমান? বর্তমান সমালোচকের মতে এর বীজ ইসলামের আদি যুগে নিহিত। ইসলামের 'উম্মা' ও 'বিরাদরি' বিশ শতাব্দীর শেষ পাদে পঞ্চাশেরও অধিক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হলেও এবং ইরান-ইরাক বা ইরাক-কুয়েত-এর মত ইসলামী রাষ্ট্র পরস্পরকে নাশ করতে উদ্যত হলেও অথবা একই ইসলামী রাষ্ট্রের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও শোষণ-পীড়ন অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি 'উম্মা' ও 'বিরাদরি'-এর এই "মিথ" এখনও মুসলিম মানসের বড় একটা অংশ জুড়ে বিরাজিত। এই কুজ্ঝটিকা-জাল অপসৃত হয়ে ভারতের শিক্ষিত মুসলমানরা 'মুসলিম ভারতীয়' নয়, 'ভারতীয় মুসলমান' হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তদনুসারে চলা আরম্ভ না করা পর্যন্ত ভারতের সংবিধানে যে রাষ্ট্রিক লক্ষ্য নির্ধারিত করা হয়েছে—এক ধর্ম-নিরপেক্ষ, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও বহুত্ববাদী (pluralist) সমাজ—সেই লক্ষ্যে চলা সম্ভব হবে না।

প্যান ইসলামের পূর্বোক্ত মানসিকতা ছাড়াও সমস্যার আরও একটি দিক আছে। ভৌত জগতে জেট যুগের সংস্কৃতি—পোষাক, খানা-পিনা, পরিবহন, নানা যন্ত্রপাতির সহায়তা ইত্যাদি—গ্রহণ করলেও ভারতের মুসলমানরা বিজ্ঞানমনস্ক হবার ব্যাপারে দ্বিধার পরিচয় দিচ্ছেন। (হিন্দুরাও যে দিচ্ছেন না এমন কথা নয়। এখনও জাতিভেদ এবং ছোঁয়া-ছুঁয়ি, অশ্লেষা-মঘা বিচার এবং এমন কি বধূ ও সতীদাহ পর্যন্ত হিন্দু সমাজে চলে। তবে তা যে মূল ধারায় অস্বীকৃত এর প্রমাণ স্পষ্ট।) কোরান-হদিসের জীবন-পদ্ধতি, স্ত্রী-পুরুষ বা মুসলমান অমুসলমান সম্পর্ক সেযুগের ভিত্তিতে প্রগতিশীল ও বিপ্লবী হলেও পরবর্তী বহু শতাব্দীতে বিশ্বের নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণ নূতন ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের দাবি রাখে। তুরস্ক, মিশর প্রমুখ বহু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এর পুনর্মূল্যায়ন ও নূতন বিধি-ব্যবস্থা গৃহীত হলেও ভারতের মুসলমানরা এখনও এক্ষেত্রে দ্বিধায় ভুগছেন। নচেৎ এখনও পুরুষের একাধিক বিবাহের (তার যতই কম উদাহরণ হোক), তিন তালাকের অধিকার ইত্যাদি থাকত না অথবা কোজদারী আইন বলে 'ডেফিনিটিউড' হিসাবে এক প্রৌঢ়া মহিলা ভূতপূর্ব ধনী স্বামীর কাছ থেকে সামান্য খোরপোষ পেলে তাই নিয়ে এমন প্রবল আলোড়ন পড়ে যেত না। গোঁড়া একদেশদর্শী এই মানসিকতার কারণে এক বিশিষ্ট মুসলমান পণ্ডিত যদি বলেন যে "শ্যাটানিক ভার্সেস" মুসলমানদের মনে আঘাত দিয়েছে বলে তিনি তার বিরুদ্ধে, তবে লেখকের মত প্রকাশের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করার তিনি সমর্থক নন, তাহলে তাঁর গর্দান নেবার ফতোয়া দেওয়া থেকে তাঁকে নানা ভাবে নিগৃহীত করা হয়। অনুরূপ ভাবে অপর এক মুসলমান পণ্ডিত যখন বলেন যে ইসলামী "কাকের" শব্দটির যথার্থ অর্থ অমুসলমান নয়, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এবং তাই ভারতের মত দেশে মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যে সহযোগিতা চলতে পারে, তখন ঘরে-বাইরে তাঁর জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়।

ভারতীয় মুসলিম-মানসের এই আধুনিকতা ও বিজ্ঞান-বিরোধী ভূমিকা এত প্রবল যে স্যার সৈয়দ আহমদের মত প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিজ্ঞান ও আধুনিকতা প্রেমীকে শরীয়-তীদের কাছে হার মানতে হয়েছিল। আফগানী থেকে রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ বা শরিয়ৎউল্লা এবং তার পরও এদেশে ইসলামের যে সংস্কার সাধনের চেষ্টা হয়েছে তার মূল কথা—শরীয়তে প্রত্যাবর্তন। কোন কামাল আতাতুর্কের

উদ্ভব ভারতের মুসলমান সমাজে হয় নি, যিনি তাঁদের এক আধুনিক রাষ্ট্রের শক্তিমান সদস্যে রূপান্তরিত করতে পারেন। আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে সুফী অথবা লোকায়ত স্তরে বাউল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধনা—ভারতের মত বহুত্ববাদী সমাজে যার মূল্য অপরিসীম—তা কট্টরপন্থী শরীয়তী মুসলমানদের দ্বারা অভিনন্দিত হয় নি। আর এঁরাই এদেশের মুসলমান সমাজের নেতা হিসাবে সক্রিয় এবং পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, 'উম্মা' রূপী "মিথ"-এর প্রভাবে। এবং কঠোর অনুশাসনের অধীন মুসলিম সমাজের ভয়ে খুব কম মুসলমানই প্রকাশ্যে এঁদের বিরোধিতা করে তাঁর সত্য বিশ্বাসের কথা বলার সাহস রাখেন।

অমলেন্দুবাবুকে ধন্যবাদ তিনি সমস্যাটির দুটি দিকের কথাই সমান গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করেছেন। বক্তব্যের সমর্থনে অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক সুলভ "পাথুরে প্রমাণ" উপস্থাপিত করার জন্য তিনি যে পরিমাণ অধ্যয়ন ও মনন করেছেন তার নিদর্শন পেয়ে চমৎকৃত হতে হয়। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের একাংশের ট্রাজিডি এই যে তাঁরা কেবল সংখ্যাগুরুদের সাম্প্রদায়িকতার উপর জোর দিয়ে নিজেদের বিশ্বসনীয়তা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু সংখ্যা-লঘুদের সাম্প্রদায়িকতাও যে সমান ক্ষতিকর এবং এক গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িকতা অপর গোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রবণতা বৃদ্ধি করে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র সমাজ সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে, ভারতের আধুনিক ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ না করা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ভারত নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। সুতরাং অমলেন্দুবাবু উভয় পক্ষের তুলামূল্য আলোচনা করে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন—এই মন্তব্য করতে বর্তমান সমালোচকের কুণ্ঠা নেই। ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রতি আচরণেরও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এই সত্যও অমলেন্দুবাবুর সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। পরিশিষ্টে বাংলাদেশের জনগণনার তথ্য থেকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সেখান হিন্দুদের দেশত্যাগ সম্বন্ধে যে চিত্র তিনি উপস্থাপিত করেছেন তা এই প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু অনেকেরই চিন্তার খোরাক জোগাবে।

ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে একটি উচ্চাঙ্গের তথ্যসমৃদ্ধ এই গ্রন্থ প্রশ্নটি সম্বন্ধে কৌতূহলী তাবৎ ব্যক্তির অবশ্য পাঠ্য। মাতৃভাষায় তাঁর এই সারস্বত কৃতির জন্য অমলেন্দুবাবুকে পুনরপি ধন্যবাদ।

ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা—অমলেন্দু দে/ রত্না প্রকাশন কলকাতা ৭৫ / মূল্য ৩৫ টাকা

আত্মকথায় হেমচন্দ্র গুহ

সনাতন মিত্র

অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহ প্রযুক্তিগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেই শুধু অসামান্য যোগ্যতা অর্জন করেন নি, আমাদের দেশে এবং বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে শিল্প-সমৃদ্ধ আধুনিক সমাজের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় একটি বিদ্যার চর্চার ইতিহাসেও চিরকালের জন্যে একটি স্থান করে নিয়েছেন। সে-স্থান পথিকৃতের, পথনির্দেশকের। আজ আমাদের সমাজে এনজিনিয়ার-এর খুব কদর, তার নানা শাখায় ভর্তির জন্যে সেরা ছাত্রদের মধ্যে দেখি প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। এতটা হয়ত ভালও নয়। ছাত্রদের মধ্যে মেধায়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, বিদ্যাচর্চার ঐকান্তিক আগ্রহে যারা সবার ওপরে, তাদের সবাইকে নির্বিচারে কারিগরি শিক্ষায় ঢুকিয়ে দিতে পারলে তাতেই সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল, এ ধারণা সত্য নয়। এতে যেমন সমাজেরও লোকসান, তেমনি বহুশখাক মেধাবী ছাত্র, যারা অন্যপথে গেলে অধিকতর চরিতার্থতা লাভ করতে পারত, তাদেরও ক্ষতি। এ-সবই সত্যি কথা এবং এ বিষয়ে আমাদের ছাত্রদের এবং তাদের উচ্চাভিলাষী বাবা-মাদেরও অবহিত হওয়া দরকার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমরা ভুলতে পারি না, কারিগরি বিদ্যা ছাড়া কোনও দেশের একপা-ও এগোনোর ক্ষমতা নেই। এবং অধ্যাপক গুহ যখন উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশ করেন, সে আজ থেকে প্রায় সত্তর বাহাত্তর বছর আগেকার কথা, তখন আমরা সে-বিদ্যাকে তেমন আমল দিতে শিখিনি। গুহ নিজেই বলেছেন, "সে আমলে লোক জীবিকা বলতে বুঝত ওকালতি, মোসায়েবি, পুলিশের চাকরি, ইংরেজ সরকারের অধীনে কেরানীগিরি, মুৎসুদ্দীর জীবিকা, ব্যবসাদারি, অথবা খুব বেশি হলে

ডাক্তারি পড়া। কারিগরি বিদ্যা বা এনজিনিয়ারিং যে কখনও সাধারণ ঘরের সাধারণ ছেলের জীবিকা হিসাবে গৃহীত হতে পারে এমনটা অনেক আলোকপ্রাপ্ত পরিবারেও ভাবনার অতীভূত ছিল না।" কাজেই, এমন একটা সময়ে একটি কারিগরি বিদ্যাকে নিজের বৃত্তি হিসেবে নির্বাচন করে অধ্যাপক গুহ শুধু যে শিক্ষা ক্ষেত্রেই নতুন যুগের প্রবর্তনে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দান করেছেন তাই নয়, বলতে পারি, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার এক অগ্রগণ্য স্থপতির সম্মানের আসনেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

সেটা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের এক প্রবল উচ্ছ্বাসের কাল, তার ঢেউ এসে বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজের ভাল ছাত্র হেমচন্দ্রকেও ধাক্কা মেরেছিল। "কলেজ থেকে বেরিয়ে এল প্রায় অর্ধেক ছাত্র।" তার সঙ্গে হেমচন্দ্রও। "ব্যক্তি জীবনের সাকল্যের সেই সমস্ত সম্ভাবনাকে অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে, কয়েকটা টাকা সম্বল করে আমি ও আমার বন্ধু শ্যামাপ্রসন্ন একদিন গভীর রাতে আমাদের সদর ঘাটের বাসা থেকে পালিয়ে চলে এলাম আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায়।"

একদিকে তিনি যখন "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ"-এর অধীন "বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনসটিটিউট"-এর ছাত্র অন্যদিকে তখন স্বাধীনতা আন্দোলন ফুলেফেঁপে উঠছে। তাঁর বয়সী আরও অনেক ছাত্রর মত তিনিও এক সঙ্কটের মুখে পড়েছেন। কংগ্রেসের ডাকে তিনিও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের সামিল হলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন চৌরিচৌরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন, হেমচন্দ্র "নিরুৎসাহ হয়ে জীবন ও জীবিকার সন্ধানে" ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শেষে হিসেব-নিকেশ করে দেখলে, তার ফল কী দাঁড়াল? জাতির পক্ষে লাভ না লোকসান? আমি হেমচন্দ্রের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানর কথা বলছি। গান্ধীর সেই সিদ্ধান্তর অনেক কটু সমালোচনা তাঁকেও শুনতে হয়েছে, আমরা এখনও শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু অন্ততঃ ওই একটি ক্ষেত্রে যে সেটা দেশের উপকারই করেছে ভেবে দেখলে তাই মনে হয়। হেমচন্দ্র গুহ দেশ স্বাধীন করার যুদ্ধ থেকে সরে এসে দেশ গঠন করার রাস্তায় না নামলে, দেশের স্বাধীনতা আরও তাড়াতাড়ি আসত, কিংবা স্বাধীন ভারতের চেহারা অন্যরকম হত, সে কথা জোর দিয়ে কে বলতে পারে? কিন্তু তাতে শিক্ষা-ক্ষেত্রে, কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে, দেশের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা যে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতাম তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অধ্যাপক গুহর শৈশবের, বালোর কৈশোরের সাগ্রহে পড়বার মত অনেক তথ্য এই বইয়ে আমরা পাই, কিন্তু সবচেয়ে যা আমাদের আগ্রহ সঞ্চার করে তা হল এদেশে কারিগরি শিক্ষার প্রচলনে প্রথম পর্বে তাঁর ক্রিয়াকলাপের বিবরণ এবং সেই সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে তার বর্তমান পরিণত অবস্থার ইতিবৃত্ত। তার আগে বিদেশে তাঁর শিক্ষালাভ, এডিনবরাতে যে পরিবারে তিনি পেয়িং-গেস্ট ছিলেন তাঁদের স্নেহ-যত্ন, যে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যোগদান করেন তার শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ, ছাত্রের প্রতি তার অধ্যাপকদের যত্নশীলতা, এসবও পড়তে খুবই ভাল লাগে, বিশেষতঃ আজকের এই সর্বব্যাপী 'নেই নেই' ধ্বনির মধ্যে।

কী রকম সেখানকার কাজকর্ম, তার একটিমাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনও জন্ম হয়নি, তখনও তার নাম যাদবপুর এনজিনিয়ারিং কলেজ। ১৯২৪ সালে সেই কলেজের ক্লাস শুরু হওয়ার এক বছর না পেরোতেই, (অধ্যাপক গুহর নিজের মুখেই শুনুন) "১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে অভাবনীয়ভাবে এসে গেল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি। এত কলেজ থাকতে, অধ্যাত্ত (তখনও) এই যাদবপুর এনজিনিয়ারিং কলেজকে হঠাৎ স্বীকৃতি দিল কেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়? এই কেন-র পেছনে ছোট একটা ইতিহাস আছে। আমার শিক্ষাজীবনের কথা প্রসঙ্গে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছি। আমার ও উগ্রনাথের যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় হবার কথাও বলতে ভুলিনি। আমাদের ধারাবাহিক ভাল রেজাল্টের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেমন খুশী হয়, তেমনি আমাদের বিষয়ে একটু উৎসাহী হয়েও পড়ে। কর্তৃপক্ষের উৎসাহের কারণ অন্য কিছু নয়, সম্পূর্ণ অজানা, অথ্যাত একটা কলেজের ছেলেরা কি করে এত ভালো রেজাল্ট করল তাই খতিয়ে দেখা। শুরু হল গোপন অনুসন্ধান। অনুসন্ধানের ফলে এই কলেজ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে এই কলেজের শিক্ষাগত মান। সে সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হবার পরই এই স্বীকৃতি। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির কথা এত বেশি করে বলার কারণ

দু'টি। প্রথমতঃ ভারতস্থ ব্রিটিশ সরকার তখনও এই কলেজকে স্বীকৃতি তো দেয়ইনি, উপরন্তু অবজ্ঞা, অসহযোগিতা করেছে পদে পদে, কিন্তু নিজের দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয় এই কলেজকে স্বীকৃতি দেওয়ায়, সরকারের পক্ষে যাদবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজকে আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা সম্ভব হল না।...অন্যদিকে এরকম প্রতিকূল অবস্থায় একটি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি এই কলেজের শিক্ষক, ছাত্র তথা পরিচালক মণ্ডলীকে নতুন উদ্যমে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা জোগাল।"

অধ্যাপক হেমচন্দ্র গুহর নিজের মুখে বলা তাঁর কর্মবহুল দীর্ঘ জীবনের এই বিবরণ এমন একটি মানুষকে আমাদের সামনে হাজির করে দিল যাঁর জীবনকাহিনী একটি দৃষ্টান্তস্থল হয়ে থাকবে আমাদের ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা-পরিচালক প্রভৃতির সামনে, অনুপ্রাণিত করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহকে।

১৯৭০ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার আগে ৪৩ বছর তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—তার ইলেকট্রিক্যাল এনজিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হিসেবে। সবশেষে উপাচার্য। আবার অবসর গ্রহণের পরেই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ছাড়েনি। সাম্মানিক অধ্যাপকের পদ দিয়ে আঁকড়ে রেখেছে। আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগ ছিল জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত।

অল্পকাল আগে এমন একজন মানুষের মৃত্যু, আমাদের মধ্যে একটা সত্যিকারে বড় শূন্যতা সৃষ্টি করে গেল।

মন ও মনীষা—হেমচন্দ্র গুহ, অনুলেখক অসীম মুখোপাধ্যায় / উমা পাবলিশিং ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা ৯ / মূল্য ৬০ টাকা।

সাবিত্রী রায়ের উপন্যাস

সুকুমারী ভট্টাচার্য

সাবিত্রী রায় মোট এগারোটি উপন্যাস রচনা করেন, তার মধ্যে দুটি তিনখণ্ডে বিভক্ত। তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনাকালে বয়স ছিল মাত্র আঠাশ, উপন্যাসটির নাম 'সৃজন'। এই সৃজনপর্ব চল্লিশ বছর অব্যাহত ছিল। নানা কারণে 'স্বরলিপি' একটি বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নীতিতে পরিবর্তন, তার সুদূর প্রসারী প্রভাব, ইতিহাসের ঘটনা। এথটনাকে ভেতর থেকে দেখবার সুযোগ ছিল সাবিত্রী রায়ের, তিনি পার্টিকর্মীর স্ত্রী, এবং নিজেও যৌবনের প্রায় শুরু থেকেই বামপন্থী ছিলেন। তাঁর দেখা রিপোর্টারের দেখা নয়, তাঁর লেখাও রাজনৈতিক সমালোচনা নয়। উপন্যাসে তাঁর দেখা রূপ পেয়েছে আট দশটি মূল নারী পুরুষের চরিত্র, বিশ্বাস, সে বিশ্বাসে আঘাত, বিশ্বাসের মূল্য দেবার জন্য রাজনীতি-সমাজে একঘরে হওয়ায়। বিশ্বাসের দুর্বলতায় কেউ মুষড়ে পড়ছে, কেউ-বা রক্তক্ষরা হৃদয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে বিশ্বাসের নিশান ধরে রুখে দাঁড়াচ্ছে। এরই অন্তরালে টানাপোড়েন চলেছে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম, স্নেহ, বন্ধুত্ব, সাহচর্যের। ঈর্ষা, ক্রোধ, লোভ, প্রাধান্য বা প্রতিষ্ঠালাভের আশায় ক্ষুদ্রতার অবতারণা করে কেউ বা ভেতরে ভেতরে আদর্শবাদকে বিসর্জন দিয়ে বাইরে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির ধ্বজা ধরে উন্নতি করছে, দুএকজন পরিবর্তিত নীতিতে আগ্রহী বা বিশ্বাসীও; কেউ দোদুল্যমান, কেউ নিরাশ, কেউ স্বপ্নদর্শী। অর্থাৎ চরিত্র ও মতবাদের নানা নমুনা এখানে চিত্রিত। এবং জীবন্তভাবে চিত্রিত।

জীবন্তভাবে, কারণ সাবিত্রী রায় অবিভক্ত বাংলাদেশকে তার প্রাকৃতিক পটভূমিকায়, সামাজিক মূল্যবোধে ও পারিবারিক পরিবেশে যথার্থভাবে জানতেন। এসব পরিমণ্ডলে চলাফেরা করার সময়ে মানুষের অন্তর্লোকে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তা-ও ভাল করেই জানতেন। জানতেন কুমারী, বিধবা, প্রৌঢ়া, বধূ, কিশোর, তরুণ, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—এঁদের বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ কেমন করে আঘাত করে নতুন প্রজন্মের সাম্যবাদী বা স্বাতন্ত্র্যবাদীকে, কিষাণ-মজুর কী চোখে দেখে "ভদ্রলোক"কে ও কী ভাবে তাদেরই বা এরা দেখে, পার্টির কর্তা ও কর্মীর পৃথক্ অনুভব, কখনো বা আচরণও, কতোয়ার সামনে মুক্তিবুদ্ধি সমর্পণ না করতে পারার যন্ত্রণা এবং অহরহ এ সংগ্রামে অন্তর্দগ্ধ চেতনার রক্তক্ষরণ—এসবই তিনি দেখেছিলেন খোলাচোখে, কিছুবা সংবেদনশীল কল্পনায়।

রাজনীতি সাবিত্রী রায়ের কাছে কোনো নির্বাত পরিমণ্ডলে কেবলমাত্র মুক্তিনির্ভর ব্যাপার নয়, কারণ রাজনীতিক কর্মী বা সংযাত্রী বঙ্গদেশের সমাজে, পরিবারেই বাস করে,

তার আত্মীয় বন্ধুর মনোভাব তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া, সে একটা আর্থসামাজিক পরিমণ্ডলেও বাস করে, যেখানে প্রাচুর্য বা অভাব তার জীবনকে বিশিষ্ট চেহারা দেয়। আর্থিকভাবে সচ্ছল নয় তাঁর অধিকাংশ চরিত্রই ; কিন্তু এদেরই মধ্যে অনেকেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বে এমন উজ্জ্বল যে অভাবের কাছে হার মানেনি তাদের প্রাণবত্তা। তারা নিজেরাই যে শুধু চূড়ান্ত অভাবের সামনে ডঙ্কা বাজিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন তা নয়, অন্যকেও অনুপ্রাণিত করেছেন। বাংলাদেশের নিসর্গ তার একান্ত বিশিষ্ট রূপ নিয়ে বারে বারে এসেছে এ উপন্যাসে—কলকাতাতেও যেমন, পল্লীগ্রামেও তেমন। এসব বর্ণনা প্রকৃতির রূপে আকৈশোর গভীরভাবে সাড়া দেবার অভ্যাস থেকে জন্মেছে, তাই এর মধ্যে খাঁটি সুরটি লেগেছে। সমাজচিত্রও তেমনই জীবন্ত তার নিজস্ব স্পষ্ট অনুপুঙ্খে। সেখানে যেমন সংঘাত, মানসিক অত্যাচার, নির্দয়তা আছে, তেমনই মানুষ তার মানবিক ঐশ্বর্যে, হৃদয়বত্তায়, সামাজিক অন্যায়ের নিষ্ঠুরতাকে রুখে দাঁড়িয়েছে সহানুভূতিপূর্ণ প্রাণে, আঁচল দিয়ে আড়াল করতে চেয়েছে আর্ত, আতুর ও অত্যাচারিতকে। খুব ছোট ছোট ঘটনার বিবরণে এগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কোথাও হয়ত বা একটু বেশি উচ্ছ্বাস আছে, হয়ত বা আর একটু সংযম থাকলে কোনো কোনো অংশ বেশি রসোত্তীর্ণ হত ; রাজনীতির তত্ত্বকথা হয়ত কোথাও একটু বেশি প্রাধান্য পেয়েছে (হয়ত সেটা ঐ যুগে অনিবার্য ছিল খানিকটা); কিন্তু সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি নিতান্তই গৌণ। যেমন বানান ভুল, ভাষার কিছু অশুদ্ধি (যা এ সংস্করণে বর্জন করতে পারলে ভাল হত)—এগুলোও পুরো উপন্যাসটির পরিসর ও তাৎপর্যের কাছে তুচ্ছ।

এ উপন্যাসের শীতা, নন্দিতা, রথী, পৃথ্বী, ফল্গু, সুমিত্রা, সাগরী, সুদর্শন, শীতাংশু, অরুণাংশু, দীপু, বিশ্বেশ্বর, প্রমীলা, মেনকা, কালু, মধু মুখার্জি, আক্রাম খাঁ, হৈমন্তী, মিঠু, এরা এবং অন্য পার্শ্বচরিত্রও সকলে জীবন্ত চরিত্র। কেউ বা পূর্ণায়তভাবে চিত্রিত, কেউ বা রেখায়। এবং এরা সত্য এদের সম্পূর্ণ মানবিক, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, স্বাদেশিক পরিসরে। এরা সত্য এদের মানসিক গণ্ডিতে, যে-গণ্ডিকে কেউ অতিক্রম করতে পারে, কেউ পারে না ; কিন্তু সেই পারা বা না-পারাটা বুদ্ধি ও আবেগের পরিসরে কথা ও সংঘাতে বিশ্বসনীয় ভাবেই চিত্রিত। এরা সত্য এদের স্বপ্ন, সাধ, ক্ষোভ, বিচ্যুতি ও সাফল্যে এবং এসব দেখানো হয়েছে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আবেষ্টনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঘটনা ও সংলাপের মাধ্যমে। এরা সত্য এদের সামাজিক, পারিবারিক, কর্মক্ষেত্রের, দলের অন্যদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায়। কেউ আদর্শ নয় ; যে বিচ্যুত তার মতাদর্শ থেকে, ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশে, তার আচরণের সমর্থন নেই, সমালোচনা আছে ; মার্জনা নেই, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা আছে। হঠাৎ পড়লে বোঝা যায় না আপাত-সরলতার গভীরে কতখানি শিল্পীর মুন্সিয়ানা আছে। যদিও এ উপন্যাসটিকে কমিউনিস্ট পার্টির একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণের দলিল হিসেবেও ভাবা যায়, তবুও এর চালচিত্র ঐ ছ'বছরের গোটা দুনিয়ার তাবৎ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি, বেকারি, সরকারি অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে প্রবল সমবেত প্রতিরোধ। ব্যক্তিগত হতাশা, ব্যর্থতার কাছে হার না মেনে বহু চরিত্র সমবেত সংগ্রামের শরিক হয়েছে—এরাই ভবিষ্যতের দিশারি।

পরিশেষে লক্ষণীয়, সাবিত্রী রায়ের রচনায় একটি গভীর মানবিক আদর্শবাদের ফল্গুধারা প্রবাহিত। এ শুধু রাজনৈতিক বিশ্বাস নয়, সমাজ মানসে স্বাধীনতাকামী ও স্বাধীনচারী মানুষের, স্বাধীনচারিণী মানবীর যে চলাফেরা তিনি চিত্রিত করেছেন অত্যন্ত সহজে, কোন ঢাকঢোল না বাজিয়ে, কোনো দীর্ঘ 'যুদ্ধং দেহি'-গোছের বক্তৃতার প্রবর্তন না করেই, সেটাতে সত্যিকার বিস্ময় জাগায়। এটা বিশেষ করে লক্ষণীয় তাঁর নারীচরিত্রে। এরা কেউ প্রেমে সফল, কেউ বা ব্যর্থ, কিন্তু প্রত্যেকেরই হৃদয়বত্তার দুটি সমান প্রকাশ, একটি তার আদর্শের ক্ষেত্রে, অন্যটি তার মানবিক সম্পর্কগুলির পরিবেশে। এরা সন্ত্রাসবাদীদের মত নয়, যদিও প্রয়োজনে তেমন আচরণও করতে হয়েছে কাউকে কাউকে, আবার এদের মধ্যে 'মেয়েলিপনা' উৎকটভাবে দেখা দেয়নি, যদিও দৈনন্দিন তুচ্ছ অনুপুঙ্খে এদের মমতাময়ী সংবেদনশীল, আদর্শবাদী অথচ সহজ স্বাভাবিক ব্যবহারে এমন একটি শ্রী ও সুষমা দেখা দিয়েছে যে বারেবারেই মনে হয়, সাবিত্রী রায় আগামী দিনের আদর্শ নারীকে স্বপ্নে দেখেছিলেন অতি স্পষ্ট করে, তাই এমন বিনা আড়ম্বরে এত সহজে এত উজ্জ্বল নারী চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলতে পেরেছেন। যে-মেয়ে অত্যাচারিণী শাশুড়ির সেবা করছে বাধ্য হয়ে, তারও একটি গভীর মানবিক আবেদনে সাড়া দেওয়ার দায় আছে বলেই সেবাটি বিশ্বাসযোগ্য ও মাধুরীমণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে, শুধু

কর্তব্যবোধে এটা হতে পারত না। তাঁর উপন্যাসে ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামী পুরুষও তেমন নারীকেই সম্মান করেছে, ভালবেসেছে, স্নেহ করেছে।

পরিবারে, সমাজে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, যথেষ্ট মন্দ, অন্যায় ও অত্যাচার আছে, এবং সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসেও এ সবই আছে। কিন্তু এদেরই সঙ্গে আছে তারা, যারা মুষ্টিবদ্ধ হাতে দৃঢ় প্রত্যয়ে এসবের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করছে, বিনা আড়ম্বরে, কিন্তু গভীর আশা ভরসা মনে নিয়ে। এই আশা ভরসা বারে বারেই ঘা খাচ্ছে অভাবের তাড়নায়, কর্মক্ষেত্রে তাচ্ছিল্যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতায়, পরিবার ও বন্ধুবর্গের মধ্যেও ভিন্ন মূল্যবোধের আঘাতে। কিন্তু হার মানছে না। এবং সর্বক্ষেত্রে এই নিরলস সংগ্রাম কিন্তু কঠোরভাবে চিত্রিত নয়, এর মধ্যে যথেষ্ট সরস উপাদান আছে বলেই আমাদের এই নায়ক নায়িকারা শুধু গ্রহণীয় নয়, বিশ্বসনীয়। কেউ কেউ অনুকরণীয়ও হয়ে ওঠে।

এ উপন্যাসের যেটি রাজনৈতিক পটভূমিকা চল্লিশ বছর আগে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি মতাদর্শগত বিরোধ ও একটি মতের প্রতিষ্ঠা যাকে কেন্দ্র করে বহু ব্যক্তি ও ছোট ছোট গোষ্ঠীর জীবনে বিপর্যয় এসেছিল, সে আজ সুদূর অতীতের কাহিনী। উপন্যাসটি যদি রাজনীতি সর্বস্ব হত, তাহলে আজকের পাঠকের কাছে তার কোনো আবেদন থাকত না। আমরা যে এখনও 'স্বরলিপি' পড়ি, তার একটা কারণ, ঐ ধরনের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে মাঝে মাঝেই দেখা গেছে। কিন্তু এ উপন্যাসের প্রাণ অন্যত্র : মানুষের, সাম্যবাদী মানুষের, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, ঈর্ষা, দ্বেষ, স্বার্থত্যাগ, ক্ষমা সবই ঐ রাজনৈতিক ঘটনাটির চারপাশে আবর্তিত হয়েছে। এবং সেখানে যে নরনারীকে সাবিত্রী রায় উপস্থাপিত করেছেন তাদের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসটি গভীরভাবে মানবিক সত্যকে স্পর্শ করেছে। এই স্পর্শে তারা যথার্থ আমাদের পরিচিত জগতের মানুষেরই প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে। শুধু, এই জগৎটিকে সাবিত্রী রায় শিল্পীর কুশলতায় সংসারের ক্লেদমালিন্যকে ছাড়িয়ে একটু ঊর্ধ্বে স্থাপনা করেছেন। এতটা ঊর্ধ্বে নয় যে নায়ক-নায়িকারা নির্দোষ দেবচরিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে, কিন্তু ঠিক ততটুকুই ঊর্ধ্বে যাতে তারা বিশ্বসনীয়তা পুরোপুরি বজায় রেখেও আর একটু উন্নত চেতনার সন্ধান দেয়। এইখানেই উপন্যাসটি কালজয়ী এবং মহত্তের উপাদান বহন করছে।

সাবিত্রী রায়ের রচনায় অদ্ভুত একটা শুচিতা আছে। সেটা দেহ বিবর্জিত আদর্শবাদ একেবারেই নয়, বরং শরীর-মন-পরিবার-সমাজ-দেশ সব নিয়ে পূর্ণ পরিসরের গোটা মানুষকে চিত্রিত করতে পেরেছেন বলেই, কোনো একটা উপাদান একান্ত হয়ে উঠে শিল্প কর্মকে মলিন করে তুলতে পারেনি। আদর্শের প্রণোদনা ও তার জন্যে সংগ্রামের নিরন্তর প্রেরণাই মূল চরিত্রগুলিকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করেছে, যেখানে তাদের চিন্তা, কথা, আচরণ কখনোই পারিপার্শ্বিক আবর্তের ঘোলা পাকের মধ্যে আটকে পড়ে না, তাই সমগ্র রচনাটি এক শুচিতার পরিবহ লাভ করে।

স্বরলিপি (১৯৫২)—সাবিত্রী রায়, ১৯৯২ সংস্করণ সম্পাদনা সুজিৎ ঘোষ/রত্না প্রকাশন কলিকাতা ৭৫/ মূল্য ৬০ টাকা।

মাতৃভাষায় আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ আরও একখানি অসাধারণ বিজ্ঞান গ্রন্থ আমাদের উপহার দিলেন। ইলেকট্রন ও তার বর্ণালী গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ইতোমধ্যে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত। আলোচ্য গ্রন্থটি তারই দ্বিতীয় খণ্ড।

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রমুখ স্নাতক (সামাজিক) পর্যায়ের উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা করে পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রমহলে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছিলেন। মনে হয়েছিল মাতৃভাষায় পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানচর্চা এই শুরু হল বলে। মনে হবার কারণও ছিল। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মত অনেকেরই এই প্রত্যয় ছিল যে, বাংলার চেয়েও দুর্বল ভাষায় যদি বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব হয় তাহলে বাংলাতে অবশ্যই সম্ভব এবং অবশ্যই প্রয়োজনীয়। দ্বিধা ছিল খানিকটা শিক্ষক মহলেই। সে দ্বিধা আজও পুরোপুরি দূর হয়নি, তবে অনেকটা মিলিয়েছে। কিন্তু

সংশয় সন্দেহ একেবারেই যায়নি প্রকাশক মহলে। এ রাজ্যের প্রকাশকরা বড় অদ্ভুত প্রজাতি। পাঠকের প্রয়োজন, চাহিদা, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা নতুন কিছু ভাবতে পারেন না, খোঁজখবর রাখেন না। স্নাতক (সামাজিক) পর্যায়ে, অন্ততঃ, যদি সব পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষায় পাওয়া যেত, তবে আমাদের বিশ্বাস যে, ছাত্রদের একটা বড় অংশ মাতৃভাষাতেই লেখাপড়া করত। একমাত্র রাজ্য পুস্তক পর্ষদই নিয়মিত কিছু বই ছাপে। যদিও তাদের প্রকাশনায় কোন পরিকল্পনার ছাপ খুঁজে পাওয়া ভার। নেই তাদের বিপণনের তাগিদ। আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশ কাল জুলাই ১৯৯১, অথচ এ বছরের গোড়াতেও পর্ষদের পুস্তক তালিকায় বইটির নাম চোখে পড়েনি!

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছিলেন, "বিশেষ কোন বিদ্যার্থী শ্রেণীর কথা ভেবে লেখা না হলেও এর মধ্যে এমন অনেক জিনিস চলে গেছে যা হয়ত স্নাতক স্তরের বিদ্যার্থীদের মন্দ লাগবে না।" আর দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় —"ভৌত রসায়ন এবং অণু-পরমাণু গবেষক ছাড়াও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের বিজ্ঞান পড়ুয়ারা এর মধ্যে কিছু কিছু আগ্রহের উপকরণ পেতে পারেন। বিশেষ করে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যার ছাত্রেরা।"

ঢক্কানিনাদের এই যুগে এতটা বিনয় বোধ করি ভাল নয়। বর্ণালীবিজ্ঞানের এই আধুনিক শাখাটির সঙ্গে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নবিদ্যার ছাত্রদের পরিচয় ঘটাতে এ বই প্রভূত সাহায্য করবে। এমনকি স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়ারাও উপকৃত হবেন। এবং অবশ্য স্বীকার্য যে এই স্তরে এমন উঁচুমানের বই বাংলাভাষায় খুব সামান্য আছে। জটিল বিষয়কে লেখক ধাপে ধাপে ভেঙে সরল সহজ ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন। তবে—"ঝোঁকটা দেওয়া হয়েছে কথার সাহায্যে মনশ্চক্ষুবি এঁকে দেওয়ার উপরে। সেই কারণে গণিতের ব্যবহার যথাসাধ্য কম করা হয়েছে।"—তাতে লাভ হয়েছে কী। চিনি ছাড়া পায়েস যদি বা হয়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ গণিতের সাহায্য ছাড়া অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। বরং আরও গাণিতিক বিশ্লেষণ পড়ুয়াদের / পরীক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াত। ভাল হত, সমগ্র বিষয়সূচি যদি পাঠ্যসূচির দিকে নজর রেখে সাজানো যেত। এ বই ত আর সাধারণ পড়ুয়াদের জন্য লেখা 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান'-এর বই নয়। কিন্তু যা পেয়েছি তাও অনেক। বিশেষতঃ ইলেকট্রন বর্ণালী বীক্ষণের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যাঁদের আগ্রহ তাঁদের জন্য এই বই এর দুটো খণ্ডই অবশ্যপাঠ্য।

কিছু নিন্দে না করলেই নয়। বই-এর শেষে শুদ্ধিপত্র পুরো এক পাতা। তবু কিছু ছাপার ভুল আছে, এমনকি শুদ্ধিপত্রেও ভুল। একেবারেই বেমানান অধিকাংশ রেখা-চিত্র। আর একটু ভাল কাগজে আরও উন্নতমানের ছাপা আশা করা কি অন্যায়? এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা বই-এর জন্য পাঠক আরও একটু খরচ করতে দ্বিধা করবে বলে ত মনে হয় না।

আর, লেখকের প্রতি নিবেদন, একবার ভেবে দেখবেন যে বই-এর নামকরণ যথার্থ হয়েছে কি? 'তার' শব্দটি বাদ গেলেই ভাল হত।

পুনশ্চ: বর্তমান গ্রন্থটির আর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ বিষয়পঞ্জি। এদেশে, কেন জানি না, এ বিষয়ে তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজটা দায়সারা।

আলোচ্য অপর গ্রন্থের লেখক হারুন-অর-রশীদ ভূমিকায় লিখেছেন, "পদার্থজীবনের গত ষাট বছরের যুগান্তকারী কিছু ধারণা বাংলায় উপস্থিত করার প্রচেষ্টা দুঃসাহসিক বলে মনে হতে পারে।"

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ডালটন প্রস্তাবিত পরমাণুবাদ ঝড় তুলেছিল। ঐ শতকের শেষে আবিষ্কৃত হল ইলেকট্রনের অস্তিত্ব। তারপর ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। ঐ সময় পর্যন্ত নিউটনের গতিসূত্র, মাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্ব ইত্যাদি দ্বারা আমাদের জ্ঞানের জগৎ ছিল যথেষ্ট আলোকিত। পদার্থের ধর্ম, গতি প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আমাদের সামনে ছিল। এমন কি গ্রহ নক্ষত্রের গতিপথ, অবস্থান ইত্যাদিও ভালভাবেই অনুধাবন করা যাচ্ছিল। 'সামান্য' কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, আলো-আঁধারি নজরে পড়েছিল, তা উপেক্ষা করলেও চলত হয়ত। কিন্তু গোল বাধায় মানুষের অন্তহীন জিজ্ঞাসা। আর জিজ্ঞাসা আছে বলেই বিজ্ঞান এমন কি নিউটনের তত্ত্বেও সন্দেহ প্রকাশ করেছে, —তাকে সর্বশক্তিমান বলে মানেনি। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ইত্যাদি নব নব ধারণাকে বরণ

করে সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে এগিয়ে চলেছে মানুষ। আর কী দ্রুত বিস্ময়কর সে অগ্রগতি, কী রোমাঞ্চকর সে বিস্ময়! সেই বিস্ময়ের নানা পর্যায়, নানা দিক হারুন অর রশীদ পরিবেশন করেছেন আলোচ্য গ্রন্থের তেরটি প্রবন্ধে। বস্তু পরিসংস্থান থেকে শুরু করে সৃষ্টিতত্ত্বের আধুনিকতম ধারণা কৌতূহলী পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছেন লেখক। 'আজকের পদার্থবিজ্ঞানের রূপ রস বর্ণ ও গন্ধের বিচিত্র বিমূর্ত ধারণাসম্ভার' স্বল্প পরিসরে সরল সরস ভঙ্গিতে বর্ণনা করা সমান্য কাজ নয়।

"এই সময়ে দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল এবং আইনস্টাইন নিঃশব্দে প্রবেশ করলেন।···ডাক্তার তাঁকে ধূমপান করতে নিষেধ করেছেন, তামাক চুরি করতে মানা করেননি এবং এখন তিনি ঠিক তাই করতে এসেছেন।··· তারপর একবার দৃঢ়স্বরে 'আইনস্টাইন' উচ্চারণ করে বোর ফিরে তাকালেন। দুজন পরস্পরের মুখোমুখি হলেন।"

এই দু'জন হলেন নীলস বোর ও আলবার্ট আইনস্টাইন। পদার্থবিজ্ঞানের দুই মহান নায়ক। টানটান গল্পের মশলা, অসামান্য বর্ণনা ভঙ্গি, সহজ ভাষা এই বই-এর সম্পদ। পদার্থ বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্ব আজ এমন এক পর্যায়ে উন্নীত যে সরল সরস ভাষায় তার উপস্থাপনা বড় সহজ নয়, ঝুঁকিও থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ব পরিচয়ে' বলেছিলেন, দয়া করে বঞ্চিত করাটাকে দয়া বলে না। লেখকও সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক। জটিল বলে তিনি সত্যকে সংকুচিত করেননি, তত্ত্বকে আড়াল করেন নি। অবশ্য যে কোন 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান' গ্রন্থের লেখকের মতই তিনি সহজবোধ্য কারণে অঙ্ককে এড়িয়ে চলেছেন। সে ত দয়া নয়, দায়। তবে কোন কোন প্রবন্ধের অংশ বিশেষে হোঁচট খেতে খেতে মনে হয় যেন এতটা নির্দয় না হয়ে যদি বঞ্চিত করতেন, বুঝি সেও ছিল ভাল। যথা—

"প্রমাণ-নম্বা (অর্থাৎ এস. ইউ (৩) × এস. ইউ (২) × এস. ইউ (১) দলভিত্তিক নম্বা) সত্যি হলেও, পরম একীভূত তত্ত্ব (এস. ইউ (৫), এস. ও (১০), ই (৬) দলভিত্তিক নম্বা) আংশিক সত্য হলেও, কোনটাই পুরোপুরি সত্য বলে দাবি করা যায় না।"

'দস্তহীনদের প্রশ্রয়' দিতে চান না লেখক, তা বলে পাঠকের দাঁত উপড়ে ফেলার চেষ্টাও নিশ্চয়ই কাম্য হতে পারে না। তা যাক গে, বুদ্ধিমান পাঠক অমন দু একখানা 'বাউন্সার' এড়িয়ে বা হজম করে 'ক্রিজে' দাঁড়িয়ে থাকতে জানে। সব মিলিয়ে প্রাপ্তি বেশ ভাল। প্রবন্ধগুলি সম্ভবতঃ বিভিন্ন সময়ে লিখিত। সামান্য পরিমার্জনার প্রয়োজন ছিল। যেমন 'কোয়ার্ক' সম্পর্কিত আলোচনা ছড়িয়ে আছে তিনটি প্রবন্ধে (রূপ রস বর্ণ ও গন্ধের বিচিত্র কোয়ার্ক জগৎ, উদ্যানগ্রের বিশ্ব, কণা জগতের নন্দন-তত্ত্ব)। অতৃপ্তি থেকে যায় মাত্র ছ পাতায় 'মৌলিক বস্তুকণার' আলোচনা ফুরোলে, এমন কি 'কোয়ান্টাম বলবিদ্যার পঞ্চাশ বছরের' জন্য ১৮ পাতা যথেষ্ট নয়।

কিন্তু অতৃপ্তি আছে বলেই চাহিদা আরও তীব্র। ভারতীয় উপমহাদেশের বাসিন্দা আমরা, সত্যেন্দ্রনাথ বা সালামের কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করি। দুটি আলাদা প্রবন্ধে, তাঁদের কাজের বিবরণ আমাদের পুলকিত করে। কিন্তু নেই কেন রমণ বা চন্দ্রশেখরের কাজের বিবরণ (চন্দ্রশেখরের সম্পর্কে কয়েক লাইন মাত্র?) থাকলে বেশ হত। এমন একখানা বই পাঠকের হাতে তুলে দেবার জন্য সাধুবাদ জানাই ঢাকার বাংলা একাডেমীকেও।

ইলেকট্রন ও তার বর্ণালী (দ্বিতীয় খণ্ড)—দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ/মূল্য ৫০ টাকা।

পদার্থবিজ্ঞানে বিপ্লব—এ. এম. হারুণ-অর-রশীদ বাংলা একাডেমী ঢাকা/মূল্য ৫০ টাকা।

হিন্দু কলেজ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

কলকাতা ভারতে আধুনিকতার স্নায়ুকেন্দ্র। যে-বাহনটিতে আরোহণ করে আধুনিকতা এদেশে এসেছে সেই বাহনটি হল শিক্ষা। রামমোহনের আবির্ভাবের তাৎপর্য-গুলিকে শুধুমাত্র উল্লেখ করারও এখানে স্থানাভাব। তবে 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' লিখতে গিয়ে

ভারতীয় 'জাতীয়তাবাদের পিতামহ' বলে সম্মানিত স্বয়ং রাজনারায়ণ বসু আধুনিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারে রামমোহনের বিশেষ ভূমিকার কথা মোটামুটি বিশদ ভাবেই লিখেছেন। একথা সর্বজনবিদিত যে একদা প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল ভারতের সর্ব শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এখন সর্ব শ্রেষ্ঠ না হলেও শ্রেষ্ঠগুলির অন্যতম। কী ভাবে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হল? এর প্রধান দুজন উদ্যোক্তা ছিলেন ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন। কিন্তু এর টাকা আসবে কোথা থেকে? ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর স্থানীয় বিত্তবানরা মিলিতভাবে অর্থের ব্যবস্থা করল। তবে স্থানীয় বিত্তবানরা অর্থ সাহায্যের জন্যে একটা শর্ত দিল। কোনও দুজ্ঞেয় কারণে দেখা যায় যে বিত্তবানরা সাধারণত গোঁড়া ধার্মিক হয়। তাই এক্ষেত্রেও বিত্তবান গোঁড়া ধার্মিকরা এই শর্তে অর্থ সাহায্যে রাজি হল যে উদ্যোগীদের থেকে রামমোহনকে বাদ দিতে হবে। রামমোহন নাম চাননি, শিক্ষা চেয়েছিলেন। আর কোনও বাধা থাকল না, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। আধুনিক শিক্ষার প্রসারে ঐ ধর্মরক্ষকদের দায়-দায়িত্ব হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতেই শেষ। রামমোহন ঐ শিক্ষার প্রসারে আরও এগোলেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন গভর্নর জেনারল লর্ড আমহার্স্টকে যে ঐতিহাসিক পত্র রামমোহন লিখেছিলেন তা রাজনারায়ণ পুরোটাই উদ্ধার করেছেন। অনেকের মতে ভারতের নবজাগরণ সূচিত হয় ঐ পত্র থেকে। যাহোক, ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের সাম্প্রদায়িক রূপ বিশেষ ভাবে প্রকটিত হলে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহাউসি একটি 'অসাম্প্রদায়িক কলেজ স্থাপন করিতে অভিলাষ করেন।' তার ফলে হিন্দু কলেজের উচ্চতর প্রথম দু শ্রেণীকে পৃথক করে নিয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়।

রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের বিষয়ে যে অংশটি লিখেছেন সেখানে চতুর্থ শিক্ষক ডিরোজিও সাহেবই নায়ক। ডিরোজিও ভারতবর্ষের উদ্দেশে ইংরেজিতে যে-কবিতাটি লিখেছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটির যে-অনুবাদ করেছিলেন সেই মূল এবং অনুবাদ দুটোই রাজনারায়ণ উদ্ধার করেছেন। সম্ভবত ডিরোজিও-ই প্রথম সমগ্র ভারতবর্ষকে 'মাই কান্ট্রি' বলে কল্পনা করেছিলেন এবং সেদিক থেকে তিনিই 'ভারতীয় জাতীয়তা'র প্রথম উদ্গাতা। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষকদের স্মরণ করে রাজনারায়ণ কলেজের যেসব ছাত্র পরে খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বিচার হয় তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যগুলি সাধনের ফলাফল অনুসারে। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্সি কলেজের তুল্য গৌরব দেশের খুব অল্প প্রতিষ্ঠানই দাবি করতে পারে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ১৭৫ বৎসর পূর্তির মুখে শ্রীঅশোককুমার রায় একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। এটি মূলত স্মৃতিধর্মী রচনা কিন্তু ভারতের নবজাগরণে এর ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। এবং রচনার প্রসাদগুণে এর সাহিত্যিক মূল্যও প্রচুর। সম্পাদক মহাশয় জানিয়েছেন যে ১৮৭৫-এর ১ জানুয়ারিতে কলেজের প্রথম পুনর্মিলন উপলক্ষে রাজনারায়ণ বক্তৃতার আকারে এটি রচনা করেছিলেন। ঐ পুনর্মিলনের প্রস্তাবক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নরকত নিকুঞ্জে তা অনুষ্ঠিত হয়। এখন ঐখানে আছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পাদক মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত ও তথ্যসমৃদ্ধ ভূমিকাতে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম দুটি পুনর্মিলন উৎসব সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় উত্থাপন করেছেন—যেমন দ্বিতীয় পুনর্মিলন উৎসবে পঠিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুহৃৎ সমাগম' কবিতাটি পুরোটাই উদ্ধার করে দিয়েছেন। দুষ্প্রাপ্য রচনাবলীকে আধুনিক পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়ে তিনি নবজাগরণের বিষয়ে গবেষকদের কাজ সহজ করেছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এই পুস্তিকায় রাজনারায়ণের রচনাটির প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি যোগ করে সম্পাদক মহাশয় বইটির প্রামাণ্য মূল্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। রচনাটির পাঠ যাতে যথা-সম্ভব নির্ভরযোগ্য হয় তাই দ্বিতীয় মুদ্রণের সঙ্গে প্রথম মুদ্রণেরও তুলনামূলক বিচার করেছেন পুস্তিকার বর্তমান মুদ্রণের সময়। আর পরিশেষে যোগ করেছেন এই কলেজ সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনার সঙ্কেত সূচী।

হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত—
রাজনারায়ণ বসু সম্পাদক অশোককুমার রায় / তুলট ১৩বি শ্রীকৃষ্ণ লেন কলকাতা ৪ / মূল্য ১২ টাকা।

ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থ

সন্মথনাথ ঘোষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ছিল ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশের উপনিবেশ। এই সব দেশের অনেকেই উপনিবেশ গড়ে ওঠার আগে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করত। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে এরা হয়ে উঠল শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানিকারক আর রপ্তানি করতে লাগল কৃষিজাত পণ্য এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পণ্য। এইভাবেই উপনিবেশের মালিকেরা গড়ে তুলল তাদের ঐশ্বর্যসম্ভার। তারা হয়ে উঠল ঐশ্বর্যশালী আর একদা সম্পদশালী দেশগুলি পরিণত হল দরিদ্র দেশে। কিন্তু ১৯৪৫ সালের পর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত তীব্র হয়ে ওঠায় এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হওয়ায় উত্তরের শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির পক্ষে আর উপনিবেশ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। এই দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করল। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি সর্বজন স্বীকৃত হল। সামরিক শক্তির সাহায্যে অপর দেশ দখলে রাখা অপরাধ বলে বিবেচিত হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে নূতন করে গঠন করার প্রয়োজন দেখা দেয় কারণ পুরোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তিতে। আর্থিক দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দু ইংল্যাণ্ড থেকে স্থানান্তরিত হয় আমেরিকায়। এবং আমেরিকা হয়ে ওঠে বহুল উৎপাদন ও আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানের অধিকারী। ব্রিটন উড ইনস্টিটিউট ডলারের সঙ্গে অন্য মুদ্রার স্থির মূল্য নির্ধারণ করে। শুল্কের হার কমিয়ে বা অন্য বাধা দ্রব করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবার জন্য বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশ চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রথমে ২৬টি দেশ এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং ১৯৪৮ সালে GATT প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও এই চুক্তিতে সামিল হয়, কারণ তাদের শিল্পের প্রাথমিক পণ্য বিক্রয় করতে হবে উন্নত দেশে এবং উন্নত দেশ থেকে শিল্পায়নের সরঞ্জাম এবং আধুনিক প্রযুক্তি সংগ্রহ করতে হবে।

ধনতন্ত্র বেঁচে থাকে সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে। সম্প্রসারণের জন্য চাই নৈসর্গিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ—প্রয়োজন সম্পদের একত্রীকরণ ও পুনর্বিনিয়োগ। কোন উন্নত দেশে উপনিবেশ না থাকায় আমেরিকা সারা পৃথিবীতে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য উদারীকরণের আওয়াজ তোলে এবং তার বহুজাতিক সংস্থাগুলির সম্প্রসারণের অনুকূল বাতাবরণের সৃষ্টি করে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে তার আধিপত্য নেই সেখানে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে দ্বিধা করে না। কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য কম রাখবার জন্য ভরতুকি দেওয়া হয়। এইভাবে আমেরিকা উদারীকরণের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ায়। তার বহুল উৎপাদনের হাতিয়ার বহুজাতিক সংস্থাগুলি এই উদারীকরণের মাধ্যমেই ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। আজ আর উপনিবেশ স্থাপন করে বা gunboat diplomacyর মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তাই IMF ও World Bank-এর মাধ্যমে আমেরিকার উৎপাদন ব্যবস্থা তৃতীয় বিশ্বের তথা উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। Information mediaকে ব্যবহার করা হয় মানুষের চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এবং মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করবার জন্য। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সকলেরই একটা ধারণা আছে উত্তরের শিল্পোন্নত দেশ থেকে সাহায্য ও ঋণের মাধ্যমে দক্ষিণের তৃতীয় বিশ্বে সম্পদ স্থানান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু উত্তরের দেশের হিসাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কয়েক শত বিলিয়ন ডলার দক্ষিণ থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে উত্তরের শিল্পোন্নত দেশে। বিগত কয়েক দশকে শিল্পজাত দ্রব্য যথা মেশিনারি, পেট্রোকেমিকাল, প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রভৃতির দাম বেড়েছে

বেশ কয়েকগুণ অথচ শিল্পের প্রাথমিক পণ্যের মূল্য বিশেষ বাড়ে নি। এ ছাড়াও শিল্পোন্নত দেশে সঞ্চিত আছে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কয়েক শত বিলিয়ন ডলার (Joecy-র হিসাব অনুসারে)।

তেলের দাম বেড়ে যাবার পর ব্রিটন উডের আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। Fixed currency-র বদলে floating currency-র প্রবর্তন করা হয় সব মুশকিল আসানের আশায়। কিন্তু floating currency নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। চিরাচরিত শিল্পের (traditional industry) ক্ষেত্রে আমেরিকা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। আর তার গবেষণালব্ধ বস্তুর উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্তন করে আর উন্নতমানের ঐ বস্তু উৎপন্ন করা সম্ভব হয় বিভিন্ন দেশে। সাধারণত দেখা যায় কোন নূতন বস্তু বাজারে আসার তিন চার বৎসরের মধ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে অন্যদেশে ঐ বস্তু উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার বহুজাতিক সংস্থাগুলি চায় শিল্প বিনিয়োগের নিরাপত্তা (protection of industrial capital) এবং মূলধনী বিনিয়োগের প্রসার (expansion of finance capital), বিভিন্ন দেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের যে বাধা আছে তার অপসারণ করে বাজারে অনুপ্রবেশের অধিকার। অনুপ্রবেশের জন্য প্রয়োজন ঐ দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ার ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন। এই সব পরিবর্তন ঘটাবার জন্য আমদানি-রপ্তানিতে কিন্তু সুযোগ সুবিধা দিতে চায় অনুন্নত দেশগুলিকে। ডাঙ্কেল প্রস্তাবে ঐগুলিকে favoured nation নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। আরও চাওয়া হয়েছে বিজ্ঞানের নয়া উদ্ভাবনের উপর একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু নয়া উদ্ভাবন আজ আর কোন ব্যক্তির নিজস্ব কৃতিত্ব নয়—বিনিয়োগ, গবেষণাগার, বিভিন্ন বিজ্ঞানীর গবেষণা ইত্যাদির সম্মিলিত ফলেই নয়া উদ্ভাবন সম্ভব হয়।

বহুজাতিক সংস্থার সুবিধার দিকে নজর রেখে আমেরিকার আধিপত্যকে বজায় রাখবার জন্য উরুগুয়ের পুন্টাডেল শহরে GATT-এর অষ্টম রাউণ্ডের সভায় আমেরিকা GATT-এর আলোচ্য বিষয়ের বাইরে এই পটভূমিতে রচিত প্রস্তাব পেশ করে ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই প্রস্তাবের Midterm Review হয় ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মন্ট্রিলের মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে। এবং উচ্চ সচিব পর্যায়ে বৈঠক বসে জেনেভায় ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে। চূড়ান্ত বৈঠক করা হয় ব্রুসেলসে ১২৯০ সালের ৩রা থেকে ৭ই ডিসেম্বর। বৈঠকে শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে একদম একটা বোঝাপড়া হয় যাতে সকলের স্বার্থই বজায় থাকে এবং পরিকল্পনা নেওয়া হয় তৃতীয় বিশ্বের তথা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের উপর নির্ভরশীল করে তোলার যাতে তারা কোনদিন আত্মনির্ভরশীল হতে না পারে। আমেরিকা ও E.E.C. মিলিত ভাবে GATT-এর ডিরেক্টার জেনারেল অলিভার লং-কে ঐ প্রস্তাব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে দিয়ে গ্রহণ করাবার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলে। কিন্তু অলিভার লং তা অস্বীকার করে পদত্যাগ করেন। অস্ট্রিয় নাগরিক আর্থার ডাঙ্কেল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ডাঙ্কেল এই প্রস্তাব তৃতীয় বিশ্বের কাছে পেশ করেন এবং বলে দেন, হয় সমগ্র প্রস্তাবটাই গ্রহণ করতে হবে, না হলে সবটাই বাতিল করতে হবে। এই প্রস্তাবই ডাঙ্কেল প্রস্তাব নামে পরিচিত। প্রস্তাবের বিষয় বস্তু হল—

(a) Market access, (b) Agriculture, (c) Textile, (d) GATT rules including trade related investment measure, (e) Trade related intellectual property service, (f) Trade in services, (g) Institutional matters.

(a) Market access-এ বলা হয়েছে অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রথমে শিথিল করতে হবে ও ধীরে ধীরে তুলে দিতে হবে। আমদানি ১৯৮৬-৮৭ সালে যে পরিমাণ ছিল তা থেকে কমানো চলবে না। ২০০৩ সালের মধ্যে বাজারের চাহিদার অন্ততঃ ২% ও পরে ৩% অন্য দেশের উৎপাদকের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া চলবে না।

(b) Agriculture—কৃষিক্ষেত্রে ভরতুকির হার কমাতে হবে। কৃষিপণ্যের বাজার মূল্যের ১০%-এর বেশি কোন সরকার ভরতুকি দিতে পারবে না। কৃষি পণ্যের দামের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মূল্যের পার্থক্যকে ক্রমশঃ কমিয়ে আনতে হবে।

(c) TRIM (Trade related investment measure)—পরিষেবা (service) ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজিকে বাধা দেওয়া চলবে না—তাদের সুযোগ দিতে হবে ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স, পরিবহন, টেলিযোগ প্রভৃতি পরিষেবা ক্ষেত্রে

বহুজাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিতে হবে। এ ছাড়াও Computer Engineering, Research and Development, Hospital Service, Hotel Service প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বিদেশী পুঁজিকে বাধা দেওয়া যাবে না। **বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন কোন একটি দেশ একক ভাবে পরিবর্তন করতে পারবে না।**

(d) Trade related intellectual property right—কোন সংস্থা বা ব্যক্তি যে পণ্য বা প্রযুক্তি বা জ্ঞান, এমন কি চিকিৎসার কোন বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করবেন, তা ২০ বছরের জন্য আর কেউ প্রস্তুত করতে পারবেন না, এমন কি ঐ বস্তু অন্য পদ্ধতিতেও উৎপাদন করা যাবে না, উদ্ভাবন করলে তার জন্য রয়াল্টি দিতে হবে প্রথম উদ্ভাবককে। কৃষক এবং গবেষককেও এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। কৃষক ঐ বীজের ফসলের কোন অংশ পরবর্তী মরশুমের বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ঐ পেটেন্টের বাইরে কেউ সমার্থসাধক উন্নতমানের বস্তু বা বীজের উদ্ভাবন করলেও তার royalty পাবে ঐ পেটেন্টের মালিক।

(e) Textile—অন্যান্য পণ্যের মত তন্তুশিল্পকেও Multi Fibre Arrangement-এর আওতা থেকে সরিয়ে এনে GATT-এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে ধাপে ধাপে। ১৯৯৩ সালের মধ্যে ১৬%, ২০০০ সালের মধ্যে দুটি পর্যায়ে ১৭% ও ১৮% এবং বাকি ৪২% ২০০৩ সালের মধ্যে GATT-এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(f) Institutional matter—বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ছিল তাকে GATT-এর অন্তর্ভুক্ত করতে যে জটিলতার সৃষ্টি হবে তার নিরসনের জন্য একটি Multilateral Trading Organisation গঠন করা হবে। বলা বাহুল্য এই সংস্থা নিয়ন্ত্রিত হবে উত্তরের উন্নত দেশগুলির দ্বারাই।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ডাঙ্কেল প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া কী হবে?

এই ব্যবস্থা গৃহীত হলে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে আরও বেশি আমদানি করতে হবে। অথচ আমাদের পক্ষে উন্নত দেশে বেশি রপ্তানি করা সম্ভব নয়, কারণ রপ্তানি করার ঐ পরিমাণ পণ্য আমাদের নেই। ১৯৮৬-৮৭ সালে ভারত ১৬ লক্ষ টন ভোজ্য তেল এবং ১৯৮৭-৮৮ সালে ৬৫ লক্ষ টন চিনি আমদানি করে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। আজ আর ঐ সব বস্তু ঐ পরিমাণ আমদানির প্রয়োজন নেই। কিন্তু ডাঙ্কেল প্রস্তাব অনুসারে আমাদের আজও আমদানি করতে হবে ঐ পরিমাণের চেয়ে বেশি। আমদানি বাড়ানোর অর্থ ছিল আরও বেশি করে ঋণের ফাঁদে জড়ানো।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ গরিব। কৃষিজ ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হল এই ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ফলে অধিকাংশ মানুষের দুইবেলা খাওয়ার সংস্থান থাকবে না। এই অর্ধভুক্ত মানুষের কাছে পুরো দিনের কাজ নিশ্চয়ই আশা করা যায় না, ফলে উৎপাদনশীলতা (productibility) কমে যাবে। কৃষি ব্যবস্থার শিল্পায়ন হলে আমাদের সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়বে এবং গ্রামাঞ্চলেও বৈষম্য ভীষণভাবে বেড়ে যাবে। উৎপাদনও কমে যেতে বাধ্য কারণ প্রান্তিক চাষী, যারা সংখ্যায় বেশি এবং বেশি পরিমাণ জমি চাষ করে, তারা আর সার ব্যবহার করতে পারবে না। খাদ্যের জন্য ব্যবহার করার মত উদ্বৃত্ত ফসল তাদের আর থাকবে না।

পরিষেবা ক্ষেত্রেও আধিপত্য করার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলি তৎপর হয়ে উঠেছে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, যেখানে শিল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করে নি, finance capital সম্প্রসারণ করতে হলে এদের কৃষি ও সেবা বিভাগকেও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ডাঙ্কেল প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এটাই। ডাঙ্কেল প্রস্তাবের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলি তাদের স্থায়ী মূলধন সৃষ্টিকারী ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সম্প্রসারিত করতে চায়। এটা জানা কথা যে উন্নত দেশের ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্সের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। ফলে তারা নিজেদের দেশের উপরে আর্থিক নিয়ন্ত্রণ হারাবে, প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে না। তাদের চিকিৎসা, শিক্ষা আরও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, সাধারণ মানুষ চিকিৎসা ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে আর তাদের শিল্পোদ্যোগীরা ব্যাপারীতে পরিণত হবে।

Intellectual Property Right বা মেধাস্বত্ব

বর্তমান বিশ্বে গবেষণা এবং উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজন প্রচুর বিনিয়োগ এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারস্পরিক সহ-

যোগিতা ও জ্ঞানের বিনিময়। কিন্তু প্রস্তাবিত পেটেন্ট আইন এর কোন শর্তই পূরণ করবে না। তাই গবেষণা বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। মানুষের মেধাকে ব্যবহার করা হবে লাভ-লোকসানের নিরিখে। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরুন আসামে বা বিহারে কালাজ্বরের প্রকোপ দেখা দিল। কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কম বলে এর প্রতিবিধানের জন্য গবেষণা হবে না—গবেষণায় বিনিয়োগ করা হবে পশ্চিমের উন্নত দেশের মানুষের প্রয়োজনীয় ওষুধ উদ্ভাবনের জন্য। PBR (Patents Breeders Right) না থাকার ফলে আমাদের দেশে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী জগতে যে ব্যাপক উদ্ভাবন হচ্ছিল তার পথ রুদ্ধ হবে। ফিলিপিনস্‌এ অধিক ফলনশীল তাইচুন ধানের বীজ ও মেক্সিকোতে উন্নত গমের বীজ আবিষ্কৃত হবার পর আমাদের দেশে আরও উন্নত ধানের বীজ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তার ফলে আমাদের শস্য উৎপাদন বেড়েছে বহুল পরিমাণে। CIBA-GEIGY অধিক ফলনশীল আলুর বীজ উদ্ভাবন করে। কিন্তু আমাদের দেশে ঐ বীজ নানারকম রোগের শিকার হয়। আমাদের দেশের গবেষণাগারে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন অধিক ফলনশীল আলুর বীজ উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে ঐ বীজের পরিবর্তন ঘটিয়ে। ডাঙ্কেল প্রস্তাব গৃহীত হলে এই সব উদ্ভাবন সম্ভব হবে না, কারণ উদ্ভাবনের জন্য রয়্যালটি দিতে হবে প্রথম উদ্ভাবককে। ডাঙ্কেল প্রস্তাব অনুসারে এইভাবে মানুষের প্রজ্ঞাকে বলি দিতে হবে মানুষের লালসার কাছে। মুক্ত আবহাওয়া ও সহযোগিতার মনোভাব না থাকলে গবেষণা অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। তাই জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন প্রাণের উপর পেটেন্টকে বাধা দেবার জন্য বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন করেছেন।

এই আইনকে সুরক্ষিত করার জন্য ১৯৮৪ সালে U. S. Trade and Tariff Act-এ S 301 ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে পেটেন্ট আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য। ১৯৮৮ সালে Omnibus Trade and Competitiveness Act Super S 301 ধারা বলবৎ করা হয়েছে। আমেরিকার এই গোঁয়ার্তুমিকে GATT-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেবার চক্রান্ত চলছে। অতীতে রাষ্ট্রসংঘ যে সব আন্তর্জাতিক প্রস্তাব প্রণয়ন করেছিল, এই প্রস্তাব তার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এবং পরিবেশকে মনুষ্যোপযোগী রাখার জন্য (common future) নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী মিসেস-বার্ট ল্যাণ্ডের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয়েছিল তার রিপোর্টেরও সম্পূর্ণ বিরোধী। ১৯৭০ সালে উইলি ব্রান্ট কর্তৃক উত্তর-দক্ষিণের বৈষম্য কমানোর জন্য যে কমিশন গঠিত হয়েছিল তার রিপোর্টকেও এই প্রস্তাবে কোন আমল দেওয়া হয় নি।

এই সকল পরিবর্তন আনবার জন্য যে সংস্থা গড়ে তোলা হবে তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে উন্নত দেশগুলির হাতে—এ বিষয়ে বোধ হয় আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মারাত্মক বিষয় হল ঐ সংস্থা যে আইন প্রণয়ন করবে তা সকলকেই মানতে হবে অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের তথা উন্নয়নশীল দেশগুলির সরকারের নিজের দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের অধিকারও থাকবে না।

এবার দেখা যাক আমেরিকা তার এই প্রস্তাব কেন GATT-এর মাধ্যমে চালু করতে চাইছে। GATT-এ সব সদস্য দেশের একটি করে ভোট আছে এ কথা সত্য। কিন্তু এর সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় greenroom consultation মারফত—এই গুহীত সিদ্ধান্ত council-এ পেশ করা হয় এবং সেখানে কোন সাংবাদিককে থাকতে দেওয়া হয় না। বিশ্ববাণিজ্যে যে দেশ যত বেশি অংশগ্রহণ করে সেই দেশের মত তত বেশি প্রাধান্য পায়। ফলে আমাদের মত দেশ, যারা বিশ্ববাণিজ্যের খুব নগণ্য অংশেরই ভাগীদার, তাদের কোন কথা গুরুত্ব পাবে না। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ঐক্য না থাকার ফলেও উন্নত দেশগুলি অনেক বেশি সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারে।

IMF-World Bank-এর শর্ত মেনে নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির শিল্পে অগ্রগতি সম্ভব নয়, যদিও তাদের মূলধনের মাত্র ৫% সরবরাহ করে এই সংস্থা দুটি।

পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশ সৃষ্টি করে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে সম্পদ সংগ্রহ করত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে gunboat diplomacy ছিল তাদের সম্পদ সংগ্রহ করার মাধ্যম। বিংশ শতাব্দীতে এরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ছদ্মবেশের আশ্রয় নিয়েছিল। যেমন—চিলির প্রেসিডেন্ট আলেণ্ডেকে হত্যা করা, দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদের প্রতিষ্ঠা করে ঐ দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া, ধর্মের নামে অস্থিরতার সৃষ্টি করা (বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি) ইত্যাদি। আর আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে GATT মারফত ডাঙ্কেল প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে নয়া ঔপনিবেশিকবাদ প্রতিষ্ঠা করবার চক্রান্ত চলছে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্মশতবার্ষিকী

সন্তোষ কুমার দে

স্বনামধন্য অধ্যাপক এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্য-সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছিলেন ১৫ অক্টোবর, ১৮৯২। পরিণত বয়সে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ তারিখে তিনি পরলোক গমন করেছিলেন। এখন তাঁর জন্মশতবর্ষ চলছে, এই উপলক্ষে আমরা সেই সাহিত্য গুরুকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তিনি বহু কৃতী ছাত্র রেখে গেছেন। ডঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণা গ্রন্থে শ্রীকুমারের বিষয়ে কিছু লিখেছেন। আর দুই ছাত্র 'জরাসন্ধ' (চারুচন্দ্র চক্রবর্তী) এবং ডঃ সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও অনেক কথা শুনেছি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি যুবক শ্রীকুমারের কিছু অন্তরঙ্গ কাহিনী। মেধাবী ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন হিসাবে স্বভাবতই তিনি স্বগ্রাম বীরভূমের হাতিয়া এবং কাছাকাছি অঞ্চলে অল্প বয়সেই খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন। এম. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই তিনি রিপন কলেজে (বর্তমান নাম সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইংরেজি পড়াতে শুরু করেন। সেই সময়ে তিনি তারাশঙ্করের জন্মস্থান লাভপুর গ্রামে তাঁর এক আত্মীয়-বাড়ি বেড়াতে যান। খবর পেয়ে তারাশঙ্কর শ্রীকুমারকে দেখতে সেই বাড়িতে যান। তখন তারাশঙ্কর কিশোর বয়স্ক, এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। তিনি ভেবেছিলেন শ্রীকুমারকে দেখবেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির তরুণ অধ্যাপক। গিয়ে দেখেন শ্রীকুমার গলা ছেড়ে গান গাইছেন আর ছেলেবুড়ো সবাই তাঁকে ঘিরে বসে আছে। প্রথম দর্শনেই তারাশঙ্কর তাঁকে যে 'শ্রীকুমারদা' করে নিয়েছিলেন সেই গভীর হৃদ্যতা শেষজীবন পর্যন্ত বজায় ছিল। পরে উভয়কেই আমরা একত্রে বহুবার পেয়েছি রবিবাসর সাহিত্যসভায়। আমরা শ্রীকুমারের তরুণ বয়সের মিষ্ট গলার গান না শুনলেও রবিবারের আসরে একাধিক বার তাঁকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইতে শুনেছি। অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ মিত্রের মত গুণী সঙ্গীতজ্ঞও সে গানের একজন সমঝদার ছিলেন।

তিনি হেতমপুর রাজ কলেজ, স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। কর্মজীবনে রিপন কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, রাজশাহি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনায় তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর মুখে আলঙ্কারিক সাহিত্যিক ইংরেজির ফুলঝুরি ঝরত। শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা কবি মনোমোহন ঘোষের সার্থক উত্তরসূরি হিসাবে তিনি ছাত্র-মহলে অভিনন্দিত হতেন। রোমান্টিক যুগ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের লিরিক্যাল ব্যালাড বিষয়ে গবেষণার জন্য তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছিলেন এবং তাঁর গবেষণাগ্রন্থ বিলাতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সম্পর্কে একটি কাহিনী তাঁর নিজমুখেই শুনেছিলাম। সে কথা বলবার আগে তাঁর মত বিরল প্রতিভার কিঞ্চিৎ সান্নিধ্যলাভের উপলক্ষটুকু ব্যক্ত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ যে 'রবিবাসর' সাহিত্য-সভার 'অধিনায়ক' ছিলেন, শ্রীকুমার সেই প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ 'সর্বাধ্যক্ষ' বা সভাপতি নির্বাচিত হন ১৫ বৈশাখ ১৩৭১ তারিখে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত (১৬ ফাল্গুন, ১৩৭৬) তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ৫০ বছরেরও বেশি সময় ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার এবং ১৩৭০ সালে ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার। শ্রীকুমার সভাপতি থাকায় তাঁর কাছে নানা প্রয়োজনে আমার যাওয়ার সুযোগ হত। শেষ জীবনে যখন ঘরের মধ্যেই একটি দুর্ঘটনায় তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন তখনও আমি প্রায়ই তাঁকে দেখতে যেতাম।

সেই সময় একদিন গিয়ে দেখি, বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে একটা শক্ত বোর্ডে ক্লিপ আঁটা কাগজে খুব কষ্ট করে কিছু

তিনি লিখছেন। আমি আবেদন জানিয়ে বললাম, তিনি মুখে মুখে বলে গেলে আমি তা লিখে নিতে পারি। তিনি হেসে বললেন, 'লিখছি আমাদের দেশের এক সেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষার ইংরেজির প্রশ্নপত্র। এ ত অপর কাউকে জানানো যাবে না।' আমি অপেক্ষা করলাম, তিনি প্রশ্নপত্র লেখা শেষ করবার পর প্রাসঙ্গিক একটি ঘটনা বললেন।

তাঁর একজন ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে গিয়ে কলেজে তাঁর লেখায় এমন কিছু লিখেছিলেন যা তাঁর সেখানকার অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি ঐ তথ্যের সূত্র জানতে চাইলে ছাত্রটি জানান, বিষয়টি তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণাগ্রন্থে পেয়েছেন, গ্রন্থটির নাম *Critical Theory and Poetic Practice in the Lyrical Ballads* শুনে সেই অধ্যাপক তখনই নিজে লাইব্রেরিতে গিয়ে গবেষণা গ্রন্থখানি নিয়ে এলেন। ছাত্রটিও সেই বইখানি খুলে দেখলেন, তাতে বহু পাঠকের চিহ্ন রয়েছে, অনেকে পাশে পাশে নোট লিখেছেন।

অধ্যাপক জানতে চাইলেন, ডঃ ব্যানার্জি কোন্ সময়ে ইংলণ্ডে ছিলেন। উত্তরে যখন শুনলেন, ডঃ ব্যানার্জি আগে কখন ইংলণ্ডে যাননি তখন তিনি বিস্মিত হন।

এই ঘটনা শ্রীকুমার তাঁর ছাত্রের পত্রেই জেনেছিলেন।

সারা জীবন ইংরেজি পড়িয়ে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর নেন এবং অচিরে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর নেওয়ায় শ্রীকুমার সেই পদে নিযুক্ত হন। ইংরেজি বিভাগ থেকে সটান বাংলা বিভাগের দায়িত্বে যাওয়ায় অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি কিন্তু ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে সেই পদে অধিষ্ঠিত থেকে অবসর নেন।

এই প্রসঙ্গে জানাই, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র নিজেও একসময় রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনিই শ্রীকুমারকে রবিবাসরের সদস্য করেন। তখন থেকেই আমরা তাঁর সুললিত বাংলা বক্তৃতা শুনেছি। শ্রীকুমার যখন রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ তখন শেকসপীয়রের জন্মের চারশত বর্ষ পালনের জন্য প্রধান সাহিত্যিক কেশবচন্দ্র গুপ্ত তাঁর গিরিশ পার্কের বাড়িতে রবিবাসর ডাকেন এবং আমাকে পরামর্শ দেন, শেকসপীয়র বিষয়ে বলবার জন্য শ্রীকুমারকে অনুরোধ করতে। শ্রীকুমার সম্মত হন। তখন ঐ সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করা হয়। তিনিও সম্মত হন।

সভায় কেশববাবু (তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলে শ্রীকুমার এবং সুনীতিকুমার উভয়েই তাঁকে কেশবদা বলে ডাকতেন) একটি প্রস্তাব করলেন—'রবিবাসর বাংলা সাহিত্যের আসর, এখানে বক্তৃতাটি বিশুদ্ধ বাংলায় হওয়াই উচিত।' শ্রীকুমার হাসিমুখেই সম্মত হলেন এবং এক ঘণ্টার উপর সাবলীল বাংলাতেই ইংরেজি সাহিত্যের সেরা ব্যক্তি শেকসপীয়রের বিষয়ে আলোচনা করলেন। কেবল ব্যক্তিনাম ব্যতীত কোথাও একটিও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলেন না। সভাপতির ভাষণে সুনীতিকুমারও বক্তৃতায় এই বিশেষ দিকটির সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

শ্রীকুমারের শ্রেষ্ঠ দান 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' একখানি কালজয়ী গ্রন্থ। তিনি 'রবীন্দ্র সৃষ্টি-সমীক্ষা' নামে রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে চার খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছিলেন কিন্তু দুখণ্ড বেরুবার পর তাঁর লোকান্তর ঘটে। পত্র পত্রিকায় ইংরেজি এবং বাংলায় তাঁর বহু রচনা এখনও অগ্রন্থিত আছে। এমন কি তাঁর দুটি স্মারক বক্তৃতা—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎস্মৃতি বক্তৃতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনচন্দ্র সেন বিষয়ক বক্তৃতাও এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

ব্যক্তি জীবনে তিনি সাধুসন্তদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সীতারামদাস ওঁঙ্কারনাথ তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন। প্রতি বৎসর বিজয়ায় তাঁর যে আশীর্বাদপত্র পেতাম তাতে ছাপা থাকত ওঁঙ্কারনাথের জটাজুট মণ্ডিত হাসিমুখের ছবি। জীবনে তিনি অনেক সম্মান লাভ করেছেন, সম্বর্ধিত হয়েছেন, সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিণ্ডিকেট প্রভৃতির সদস্যও হন। এমনকি এক সময় তাঁর উপাচার্য হওয়ার কথাও ওঠে। সব বিষয়ে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে গৌরব লাভ তাঁর পক্ষে ঘটেনি বটে কিন্তু আর একটি বিরল সম্মান তিনি পেয়েছিলেন যা বোধহয় বাইরের বেশি লোক জানেন না। এ বিষয়টি, তাঁর রোগশয্যায় শুয়ে আমার নিকট বলেছিলেন, এখানে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

শ্যামাপ্রসাদ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন একদিন আচার্য অর্থাৎ গভর্নর (বোধহয় লর্ড কেসি) বিশ্ববিদ্যালয়

পরিদর্শনে আসেন। শ্যামাপ্রসাদ নিজেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখান। বিদায় বেলায় গভর্নর শ্যামাপ্রসাদকে অনুরোধ করেন, তিনি একজন উপযুক্ত অধ্যাপকের কাছে ইংরেজি সাহিত্য নিয়মিত পাঠ করতে চান। আচার্যের অনুরোধ উপাচার্য উপেক্ষা করতে পারলেন না, সেদিন সন্ধ্যায় নিজেই চলে গেলেন সার্দান এভেনিউ-এ শ্রীকুমারের বাস স্থানে। গিয়ে বললেন, 'স্যার, এ দায়িত্ব আপনাকে ছাড়া আর কাকেই বা দিতে পারি?'

শ্রীকুমারকে তিনি 'স্যার' সম্বোধনে বরাবরই শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। তিনি সেই উপাচার্য 'ছাত্রের' অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না।

নির্ধারিত দিনে শ্রীকুমার রাজভবনে গেলে এডিকং এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পাঠকক্ষে নিয়ে বসালেন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে রাজকীয় ছাত্রটি এলেন। মনে মনে বিরক্ত হলেও শ্রীকুমার শান্ত সংযত ভাবে ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে ইংরেজি সাহিত্যের রূপরেখার কথা বলতে শুরু করলেন। ক্রমে ছাত্রের আগ্রহ গভীর হল। ফল হল পরের বার যখন তিনি গেলেন, দেখেন গভর্নর আগেই এসে পাঠকক্ষে প্রতীক্ষা করছেন এবং পাঠ আরম্ভের আগে অনুমতি চাইলেন, তাঁর পত্নীও এই পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারেন কিনা। বলা বাহুল্য শ্রীকুমার সানন্দে অনুমতি দিলেন এবং তারপর থেকে দুইজনই তাঁর কাছে নিয়মিত ইংরেজি সাহিত্য পড়তেন।

মাসান্তে এডিকং একখানি বন্ধখাম একটি রূপার ট্রেতে রেখে ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ির দরজায় ধরে দিলেন। বাড়ি এসে খাম খুলে দেখেন, আশাতীত অঙ্কের করকরে নোট রয়েছে তার মধ্যে।

মাত্র কয়েকমাস গভর্নর দম্পতি তাঁর ছাত্র ছিলেন। উভয়েই তাঁদের এই বিজাতীয় শিক্ষকের প্রতি এত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়েছিলেন যে যখন গভর্নরের বদলির আদেশ এল এবং তাঁকে অবিলম্বে অষ্ট্রেলিয়া চলে যেতে হবে জানলেন তখন বিদায়ের দিন উভয়েই শিক্ষকের চরণস্পর্শ করে প্রণাম করে বললেন—আশীর্বাদ করুন যেন পরজন্মে আপনার মত শিক্ষকের কাছে সাহিত্য পড়বার সুযোগ পাই।

কথাগুলি যখন তিনি আমার কাছে বলছিলেন, তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিয়েছিল।

সেই দেখাই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎকার। বাইশ বছর চলে গেছে তিনি চলে গেছেন। আজ তাঁর পুণ্যস্মৃতি-তর্পণে তাঁর কাছে শোনা সেই কথাগুলিই উল্লেখ করে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি!

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ভাবনায় চিত্রকলা

[সূচক বক্তব্য

সব শিল্পই মূলতঃ এক। জীবনকে সকলেই প্রকাশ করে। পার্থক্য শুধু তাদের প্রকাশগত রূপে। —এ বক্তব্য অ্যারিস্টটলের। তাঁর মতে ভাস্কর যেখানে তাঁর শিল্পের উপায় (means) হিসাবে তুলে নেন ছেনি, হাতুড়ি, চিত্রকরের হাতিয়ার সেখানে রঙ তুলি। কিন্তু সব শিল্পের সামর্থ্য ও মর্যাদা কি এক? না, এবিষয়ে কোনও ঐকমত্য হয়নি। এক একজন দাঁড়িয়েছেন এক একটি শিল্পের উকিল হিসেবে। সকলেই বলতে চান তাঁর শিল্পই শ্রেষ্ঠ। তবে একটা জিনিস দেখা যায় এক একটি শিল্প এক একটি যুগ বা জাতির আত্মাকে সম্যকভাবে ব্যক্ত করে। গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ শিল্প ছিল ভাস্কর্য; মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্থাপত্যের গৌরব; চিত্রকলার শ্রেষ্ঠত্ব রেনেসাঁসে। তার কারণও আছে। গ্রীকরা প্রত্যক্ষ ও শারীরিক জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন চূড়ান্ত মর্যাদায়। তাঁদের দেবতারা ছিলেন পূর্ণ মানবিক ব্যক্তিত্বে অঙ্কিত। তাঁদের বীরেরা ছিলেন সজীব, শক্তিশালী ও পেশল। সেই শরীরের শক্তি ও সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে খ্রিস্টীয় দর্শন প্রবেশ করল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের জগতে। শরীরের ভূমিকা এখানে গৌণ। গ্রীক বীরকে যেখানে জয়ের জন্য দাঁড়াতে হত সমস্ত শক্তিকে টানটান করে সেখানে সেন্ট অ্যান্টনি শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন পবিত্রতা ও নীতির শক্তি নিয়ে। এখানে ভাস্কর্যের আর বিশেষ কিছু করার রইল না। পবিত্রতা মণ্ডিত এক সৌন্দর্যের ধারণা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। রেনেসাঁসের যুগে খ্রিস্টীয় পবিত্রতার উপর নতুন করে যখন রক্ত স্ফীত পেগান জীবন দর্শনের অভিঘাত এসে পড়ল তখন চিত্রশিল্পীরা বুঝলেন এটা তাদের যুগ। তাই চিত্রকলাই 'art of arts of Italy'. এসব আমাদের আধুনিক কালের ব্যাখ্যা। রেনেসাঁসের শিল্পীরা ঠিক এভাবে ভাবেন নি। তাঁদের কাছে সমস্যা ছিল বিষয়কে ব্যক্ত করার সমস্যা। কোন্ মাধ্যমটি তাঁদের উপলব্ধ সত্য ও সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করার পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত—এ নিয়ে তাঁরা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। রেনেসাঁস চিত্রকলার সংখ্যা ও ঐশ্বর্য আমাদের বলে দেয় তাঁদের সেই সিদ্ধান্তটি কী।

চিত্রকলার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে তাঁদের ভাবনা চিন্তা বা বক্তব্য কী ছিল তা নিয়ে কৌতূহল অস্বাভাবিক নয়। এর উত্তর খুঁজতে যার কাছে আমরা যেতে পারি তিনি রেনেসাঁসের একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী 'প্রিন্স অব আর্ট' নামে খ্যাত লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রীঃ)। কেননা শুধু তুলি দিয়ে নয়, লেখনী দিয়েও তিনি অনেক কিছু বলেছেন। তিনি আঁকতেন কম, দেখতেন ও ভাবতেন বেশি। রাফায়েলের শ্রেষ্ঠ পেট্রন লিও ১০ম (পোপ) লিওনার্দো সম্পর্কে একবার বলেছিলেন এ লোকটিকে দিয়ে কিছু হবে না। কোন কাজ আরম্ভ করার আগে তার শেষটা কী দাঁড়াবে তাই নিয়ে আগে ভাবতে আরম্ভ করে।' লিওনার্দোর ছবির গ্রীনরুমের দিকে উঁকি ঝুঁকি মারলে চমকে উঠতে হয়। প্রায় সতেরো হাজার স্কেচ বা ড্রাফট তিনি করেছিলেন। এগুলি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ভাবনা ও ছবির ঠিক মাঝখানে। ভাবুক এই মানুষটিকে 'wizard of all the Renaissance' ('wise থেকে wizard) নামেও অভিহিত করা হয়। তাঁর লেখা পত্র কীরকম? ছবি আঁকতেন বাঁ হাতে, লিখতেন ডান হাতে। তাঁর লেখাগুলি ছিল ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। বড় আশ্চর্যের কথা ডায়েরি বা নোটে নানা বিষয় নিয়ে নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও দর্শনের কথা প্রায় পাঁচ হাজার পাতা লিখলেও সেই অর্থে কোনবই তিনি লেখেন নি। লিখলে পরিমাণগত দিক থেকে

শিল্পীর চেয়ে গ্রন্থকার পরিচয়টাও কম কিছু হত না। লিওনার্দোর ডায়েরি বা নোটে ছড়ানো ছিটোন অথচ সূত্রাত্মক পরিচ্ছন্নতায় বিভিন্ন শিল্পের সাধ্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচার নিয়ে অসাধারণ ও প্রায় সম্পূর্ণ একটি বক্তব্য পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই তিনি সেই সব আলোচনায় চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন।

মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক দর্শনের নির্ণয় অনুযায়ী মানববিদ্যার সাতটি শাখা ছিল 'লিবারাল আর্টস'-এর অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে কবিতা ও সঙ্গীতের স্থান থাকলেও চিত্রকলাকে 'মেকানিকাল আর্টস' হিসাবে খাটো করে দেখা হত। কায়িক পরিশ্রম মাত্র যার সম্বল সেই হস্তশিল্পকে ধরা হত 'মেকানিকাল আর্টস' হিসাবে। লিওনার্দো তাকে চ্যালেঞ্জ জানান। এবং তিনি কাজে ও লেখায় চিত্রকলার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। লিওনার্দোর ডায়েরি ও নোট বই থেকে চিত্রকলা, সঙ্গীত, কাব্য ও ভাস্কর্যের একটি তৌলন আলোচনা সাধ্যমত বাংলা অনুবাদে সাজিয়ে দিচ্ছি। অতৃপ্ত কৌতূহলীরা আই. এ. রিচ্টার সম্পাদিত 'সিলেকশনস্ ফ্রম দ্য নোটবুকস অব লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি' বইটি দেখতে পারেন।—

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়]

একটি তৌলন আলোচনা

চিত্রকলা, সঙ্গীত, কাব্য ও ভাস্কর্য

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

চিত্রকর সবরকম মানুষ ও সমস্ত কিছুর প্রভু। যদি তার মনে হয় মনোমুগ্ধকর কোনও সৌন্দর্য তিনি দেখবেন তবে তা সৃষ্টি করার শক্তি তাঁর আছে। ইচ্ছা করলে কোন ভয়ঙ্কর দৈত্যও তিনি চিত্রিত করতে পারেন। ভাঁড়ামিপূর্ণ, হাস্যোদ্দীপক অথবা করুণাকর যে কোনও কিছুর স্রষ্টা বা ঈশ্বর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব। যদি তিনি চান তিনি রচনা করতে পারেন জনঅধ্যুষিত কোনও দেশ অথবা জনবিরল মরুভূমি, অনুষ্ণ কোনও ছায়া ঘেরা অন্ধকার অথবা শীতল আবহাওয়ার মধ্যে কোনো সুতপ্ত স্থান। যদি তিনি কোনও উপত্যকা বা পর্বতের শৃঙ্গদেশ থেকে দেখতে চান সমুদ্র পর্যন্ত আদিগন্ত বিস্তৃত কোনও বিশাল সমভূমি তবে তা রচনা করার ঐশী প্রভুত্ব তাঁর আছে। অপরপক্ষে অধিত্যকা থেকে সমুচ্চ পর্বতমালা দেখার ইচ্ছাও তিনি চরিতার্থ করতে পারেন। সত্যি কথা বলতে কি জগতে যা কিছু আছে প্রত্যক্ষে অথবা অপ্রত্যক্ষে প্রথমে তা চিত্রকরের মনে, পরে তাঁর হাতে তা আসে। এবং সেই চিত্রগুলি চমৎকার এই জন্য যে একটি অনুপাত-সঙ্গত সুসমঞ্জস অথচ সম্পূর্ণ দৃশ্য তিনি আমাদের উপহার দেন একনজরে যার মূলানুগ রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

চিত্রকলাকে যে তুচ্ছ করে সে না ভালবাসে দর্শন না প্রকৃতি। চিত্রকলা যেহেতু দৃশ্যমান প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ রূপকার সেই কারণে চিত্রকলাকে তুচ্ছ করার অর্থ আলো ও ছায়ায় মোড়া সমুদ্র ও সমতল, বৃক্ষ ও প্রাণীকুল, তৃণ ও পুষ্পের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও নিগূঢ় রহস্যদর্শনের মহিমাকে অস্বীকার করা। চিত্রকলা সত্যই বিজ্ঞান, প্রকৃতির নিজস্ব সন্তান কারণ প্রকৃতি থেকেই জন্ম নেয় চিত্রকলাগুলি। কিন্তু ঠিক করে বলতে গেলে একে বলা উচিত প্রকৃতির দৌহিত্র। কেননা সমস্ত দৃশ্যবস্তু জন্মগ্রহণ করেছে প্রকৃতি থেকে। এবং সেই সব দৃশ্যরূপ সন্তানেরা জন্ম দিয়েছে চিত্রের। সুতরাং এরা প্রকৃতির দৌহিত্র স্থানীয় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রকৃতির কাছ থেকে যে কিছু শেখে না তাকে চিত্রকলা শেখানো অসম্ভব। ব্যাপারটা অঙ্ক শিক্ষার মতই। শিক্ষক মশাই তাকে যতটা শেখান ততটাই সে শিখতে পারে। চিত্রকলায় নকল চলে না। বর্ণমালা অনুলেখিত হলেও মূলের মতই তার মূল্য, চিত্রকলায় তা হবার নয়। ছাঁচে ঢালাই করা ভাস্কর্য মূলেরই মর্যাদা পেয়ে থাকে, চিত্রে তা হয় না। অমূর্ত বিষয়কে মুদ্রিত পুস্তকে মূর্ত করা হয়, চিত্রের কাজ তা নয়।

অতুলনীয় এর মহিমা। স্রষ্টা ছাড়া আর কাউকে এ কুর্নিশ করে না। চিত্রমাত্রেই একক এবং বহুমূল্য। এর কোনও উত্তরসূরিও নেই। এই একত্বের মহিমায় চিত্র সর্বত্র প্রচারিত বিজ্ঞানকে অতিক্রম করে যায়। আমরা কি দেখি না প্রাচ্যের নৃপতিরা কীভাবে নিজেদের স্বতন্ত্র অথবা পর্দানশীন করে রাখে কেননা তারা মনে করে সর্বজনসমক্ষে তাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তাদের খেলো করে দিতে পারে; আমরা কি দেখি না দেবতাদের কীভাবে দামি ঝালর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়; তাদের আবরণ উন্মোচন করার আগে সম্পন্ন করা হয় নানারকম গীত বাদ্য সহকারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি এবং আবরণ উন্মোচনের সময় জনসাধারণ তাদের স্বাস্থ্য ও

চির আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির জন্য পূজা ও প্রার্থনায় যেভাবে নিয়োজিত করে যেন দেবতা স্বয়ং তাদের সম্মুখে উপস্থিত। এরকম ব্যাপার মানুষের অন্য কোনও শিল্পকৃতিকে কেন্দ্র করে হয় না। যদি বল এর কৃতিত্ব চিত্রকরের নয়, অঙ্কিত বিষয়ের আকর্ষণেই তারা আসে, উত্তরে বলব তা যদি হত মানুষেরা শান্তভাবে তাদের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কল্পনার কাছে নিবেদন করত তাদের ভক্তির অর্ঘ্য। তারা কষ্টকর, দুর্গম তীর্থস্থানের দিকে যাত্রা করত না। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হবে যে এর কারণ দেবদেবীর প্রতিমূর্তির প্রতি আকর্ষণ। দেবদেবী বিষয়ে যতই লেখা হোক না কেন কখনও তা প্রতিমূর্তির সমকক্ষ হতে পারে না। এর থেকে এরকম মনে হয় দেবতারাও এই চিত্রশিল্পকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন তাদের যারা চিত্রশিল্পকে এ হেন মর্যাদা দেয়। মনে হয় তারা অঙ্গকোন অনুকৃতিমূলক রূপের পরিবর্তে এই ভাবেই পূজিত হতে ভালবাসেন এবং সমবেত জনগণের বিশ্বাস অনুযায়ী এইভাবেই তাঁরা তাদের মহিমা প্রকাশ করেন ও প্রার্থিত মুক্তি দান করেন।

সঙ্গীত

সঙ্গীতকে বলা যায় চিত্রকলার কনিষ্ঠা ভগ্নী। কেননা সে শ্রবণযন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্থান দ্বিতীয়। (ঐতিহ্যগত বিচারের নিরিখে মস্তিষ্ক অনুযায়ী পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্থান মোটামুটি এইরকম—দর্শনের স্থান প্রথম, শ্রবণ দ্বিতীয়। এই দুটি ইন্দ্রিয় যথাক্রমে চিত্রকলা ও সঙ্গীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গন্ধ, আস্বাদ ও স্পর্শের স্থান এদের পরে।) সঙ্গীতের সম্মিতির ঐকতান বিরচিত হয় ধ্বনিসমূহের এককালীন ও আনুপাতিক সামঞ্জস্য; এক বা একাধিক ছন্দের সামঞ্জস্য সূত্রে নিয়ন্ত্রিত হয় তার কড়ি ও কোমল। সঙ্গীতের ছন্দোময় সুরসঙ্গতি চিত্রে বর্ণালী নকশা দ্বারা চিত্রিত মানবিক সৌন্দর্যের মধ্যেও যেন অনুভূত হয়। কিন্তু চিত্রকলার স্থান সঙ্গীতের থেকে উঁচুতে কারণ সঙ্গীত একটি দিক থেকে খুবই দুর্ভাগা—জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার বিলয় ঘটে। চিত্রের পরিণতি সেরকম নয়। চিত্র টিঁকে থাকে তার সমৃদ্ধ সঙ্গীবতা নিয়ে যদিও তার অবস্থান মাত্র একটি তলে সীমাবদ্ধ। বিস্ময়কর এই বিজ্ঞান মরণশীল জীবনের সৌন্দর্যকে ধরে রাখে এবং প্রকৃতির দৃশ্যাবলীকে দান করে কালজয়ী মহত্ত্ব। কেননা ক্রমাগত অপসৃয়মান সময় সমস্ত কিছুকে নিয়ে চলে অনিবার্য বার্ধক্যের দিকে। নৈসর্গিক প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এটা এমনই একটা বিজ্ঞান যা প্রকৃতির কাজের উপর নির্ভরশীল এবং যার একটা নিজস্ব ভূমিকা আছে—সেই কারণে একটা বাড়তি সমীহা এর প্রাপ্য।

সঙ্গীত শিল্পী দাবি করেন যে তার শিল্পকলা চিত্রকলার সমকক্ষ কারণ দুটিই বিভিন্ন অঙ্গের সমবায়ে রচিত আঙ্গিক বিশেষ। সচেতন ব্যক্তি উভয়ের মধ্যেই যে সৌন্দর্য দেখতে পান তার মধ্যে থাকে সামঞ্জস্য সূত্রে গ্রথিত ছন্দময়তা। ছন্দের এই উত্থানপতন হৃদ্যিত করে মানুষের অন্তরতর আত্মাকে। কিন্তু চিত্রকর এই প্রসঙ্গে বলতে পারেন নানা অঙ্গের সমবায়ে সৃষ্ট এই মানবদেহ শুধুমাত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ ছন্দোময়তার কারণে আনন্দদায়ী, কিন্তু আসলে তা নয়—কেননা এই সৌন্দর্যের বেশি কম আছে, এমনকি ছন্দের গ্রহনাও এক্ষেত্রে বড় কথা নয়, কারণ তারও উত্থান ও বিলয় আছে। মনে রাখতে হবে চিত্রশিল্প অঙ্কিত বিষয়কে অনেক বছরের আয়ুদান করে এবং এমন চমৎকারভাবে তার আনুপাতিক সামঞ্জস্য সুষমা সে রক্ষা করে যা প্রকৃতিরও অসাধ্য। চিত্রকলার সৌজন্যে রক্ষা পেয়েছে কত স্বর্গীয় সৌন্দর্য, সময়ের অনিবার্য টানে অথবা অপঘাতে প্রকৃতি থেকে যার মুলটিই বিনষ্ট হয়ে গেছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। সেই কারণে চিত্রকরের কাজ মহত্তর, মহত্তর এমনকি তার ধাত্রীমাতা প্রকৃতির থেকেও।

সঙ্গীতের দুটি দুর্বলতার দিক আছে। প্রথমতঃ তা মরণশীল, দ্বিতীয়তঃ তা অপচয়িত। এটা মরণশীল কেননা তাৎক্ষণিকতাই এর বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এর বিলয় ঘটে। আর অপচয়িত কেননা একবার গীত হলে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না, পুনরুদ্ধারণকে সর্বদাই দুষ্কীয় বলে মনে করা হয়।

কাব্য

একই রকম তফাৎ দেখতে পাওয়া যায় কবি এবং চিত্রকরের উপস্থাপনার মধ্যে। একজন মানুষের দেহ তা সে সুন্দরই হোক আর কুৎসিতই হোক কবি বর্ণনা করেন একটু একটু করে, পর পর, আর চিত্রকর তাকে দেখান এক সঙ্গে। কবির সঙ্গে সঙ্গীতকারের এ ব্যাপারে একটা মিল আছে। একটি গান গাইতে গেলে গাইতে হয় কলির পর কলি। পর্দায় বিলুপ্ত একটি সঙ্গীতের প্রথমাংশে Soprano তারপর

tenor তারপর contralto পরিশেষে bass—এই ভাবে গাইতে হয়। এই রকম একটি উপস্থাপনা কখনও তার আনুপাতিক সমগ্রতাকে সময়মত ঐক্যে আনতে পারে না।… আরও বলতে গেলে সঙ্গীতকার একটি কোমল স্বরকে বিভাজিত সময়ের ছন্দোময় বিন্যাসে নিবেদন করেন এবং স্বরগ্রামের নানা উত্থান পতন তিনি সৃষ্টি করতে পারেন। কবিতায় সেই স্বরগ্রামের উচ্চবচতার কোনও সুযোগ নেই। তাছাড়া তার পক্ষে সম্ভব নয় সঙ্গীতের মত সঙ্গতি সূত্রে বাঁধা কোনও ঐকতান সৃষ্টি করা। চিত্রকর যা করে থাকেন তাও তার ক্ষমতার বাইরে। চিত্রকর একই সঙ্গে বিভিন্ন জিনিসের বর্ণনা দিতে পারেন -যেগুলি সুনির্দিষ্ট সামঞ্জস্য সুষমায় বাঁধা। চিত্রের প্রতিটি অঙ্গ আমাদের মনে প্রতিক্রিয়া জাগাতে পারে আবার গোটা ছবিটা আমরা একই সঙ্গে দেখতে পাই। বিচ্ছিন্নভাবেও যেমন মিলিত ভাবেও তেমনই ছবির উপাদানগুলি যুগপৎ আমাদের ভাবিত করে।…এই সব কারণে প্রত্যক্ষ বস্তুর উপস্থাপনায় কবির স্থান চিত্রকরের অনেক নিচে এবং অপ্রত্যক্ষ বস্তুর রূপায়ণে তাঁর ক্ষমতা সঙ্গীতকারের থেকে কমজোরি।

কবি যদি লিখে লিখে কোনও বিষয়ের রূপবর্ণনা করেন চিত্রকর আলো ও ছায়ার সাহায্যে তাকেই প্রত্যক্ষ এবং সজীব করে তোলেন। মুখের বৈশেষিক অভিব্যক্তিটিকে পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলেন। কবি তাঁর কলম দিয়ে যা করতে পারেন না চিত্রকর তাঁর তুলি দিয়ে তা সম্ভব করে তোলেন।

এবং কবি তাঁর কথা কানের ভিতর দিয়ে আমাদের মর্মে পৌঁছে দেন চিত্রকর তা করেন আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। চোখ যে কানের চেয়ে উঁচুদরের ইন্দ্রিয় এতে সন্দেহ কী। উদাহরণস্বরূপ আমি বলছি একজন ভাল চিত্রকর অঙ্কন করুন যুদ্ধের একটি ভয়াবহ দৃশ্য এবং সেই একই বিষয় কবি বর্ণনা করুন ভাষায়। এবার দুজনের সৃষ্টি জনগণের কাছে রাখা হোক। তাহলেই দেখতে পাবে জনগণ কোনদিকে বেশি আকৃষ্ট হয়েছে; কোনটি নিয়ে তারা বেশি আলোচনা করছে; কোনটিকে তারা প্রশংসা করছে বেশি; কোনটিই বা তাদের বেশি তৃপ্তি দান করছে। নিঃসন্দেহে চিত্রটিই সহজবোধ্য ও সুন্দর হিসেবে বেশি মানুষকে আনন্দ দান করবে। ঈশ্বরের নাম মুদ্রিত কর এবং পাশাপাশি তার একটা ছবি আঁকো দেখবে কোনদিকে সকলে ঝুঁকে পড়েছে। চিত্রকলা প্রকৃতির সবরকম রূপকেই আত্মস্থ করতে পারে। যেক্ষেত্রে কোনও বস্তুর নাম ছাড়া কিছু নেই তোমার কাছে তাকে চিত্রায়ন করতে হলে রূপাবয়বের দিকেই ঝুঁকতে হবে। তোমার অবলম্বন যদি হয় ফলাফলের প্রদর্শন, তবে আমাদের অবলম্বন প্রদর্শনের ফলাফল। ধরো একজন কবি এক রমণীর প্রণয় সৌন্দর্য রচনা করলেন এবং একজন চিত্রকর আঁকলেন ছবিতে—দেখবে বিচারক স্বভাবতঃ কার দিকে প্রেমমুগ্ধ ভাবে ঝুঁকে পড়ে। অভিজ্ঞতার রায়ই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত।

তোমরা চিত্রকে যান্ত্রিকশিল্পের পর্যায়ভুক্ত করেছ। আমি সশব্দ প্রকাশ করি চিত্রকলাকে এইরকম বাজে অভিধায় চিহ্নিত করার কোন সঙ্গত কারণ আছে কিনা এ বিষয়ে। যদি বল এটা যান্ত্রিক, কারণ চিত্রাঙ্কন একটি শ্রমসাধ্য কাজ; যা ছিল কল্পনার বিষয় তাকে চিত্রকর রূপ দিয়েছেন হাতের সাহায্যে। তোমাদের কবিরাও কি হৃদয়গত আবেগকে লেখনীর সাহায্যে লিপিবদ্ধ করেন নি যাকে অনায়াসেই হাতের কাজ বলা যায়? এবং তুমি যদি বল এটা যান্ত্রিক এইজন্য যে এটা করা হয়েছে টাকার জন্য তা হলে বলব তুমিও একই ভুলের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছ, অবশ্যই যদি একে ভুল বলা যায়। তুমি কী জন্য লিখছ? তুমি যদি কোন নির্দেশমূলক বক্তৃতা দাও তা কি এমন ভাবেই দাও না যাতে তা বেশি অর্থপ্রসূ হয়? টাকা ছাড়া তুমি কি কোন কাজ কর? অবশ্যই আমি বলছি না এটা নিন্দনীয় কোন ব্যাপার। কেননা সমস্ত পরিশ্রমেরই অধিকার আছে উপযুক্ত প্রতিদান পাবার। এবং যদি একজন কবি বলেন আমি একটি গ্রন্থ লিখব যা সুমহান আদর্শের রূপক, মনে রাখতে হবে, একজন চিত্রকরও তা করতে পারেন। এমন কি Apelles-এর মত শিল্পীর পক্ষেও তা সম্ভব যিনি Calumny নামক কলঙ্কের ছবি এঁকে ছিলেন। যদি তুমি বল কবিতা অনেক বেশি দীর্ঘজীবী আমি বলব একজন তাম্রকারের কাজ অনেক অনেক বেশি দিন টিঁকে থাকে। কেননা তাকে রক্ষা করার ব্যাপারে সময় তোমাদের বা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সদয় যদিও তাদের কাজে কল্পনার প্রকাশ খুবই সীমিত। একটি ছবি অনেক বেশি টেঁকসই বা দীর্ঘজীবী হতে পারে যদি তামার উপর এনামেল রঙ দিয়ে তা আঁকা যায়।

আমরা আমাদের শিল্পকলার সৌজন্যে ঈশ্বরের দৌহিত্র অভিধা পেতে পারি।

কবিতা যদি মানুষের নৈতিকদর্শন নিয়ে কাজ করে

চিত্রকলা কাজ করে প্রকৃতি দর্শন নিয়ে। কবিতা যদি মনের জগতের কারবারী হয় তবে চিত্র চলমান দেহের আয়নায় প্রতিবিম্বিত মনের গতিবিধিকেই রূপায়িত করে। যদি কবিতা নরকের বর্ণনা দিয়ে মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে চিত্রকর একই জিনিস অঙ্কনের দ্বারা প্রত্যক্ষ গোচর করে অনেক বেশি ভীত করতে সক্ষম। সৌন্দর্যের হোক, ভয়েরই হোক আর কুৎসিতেরই হোক যে কোন বর্ণনা বা দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে চিত্রকর কবির তুলনায় অনেক বেশি সফল হবেন। আমরা কি দেখি নি ছবি তার স্বাভাবিকতার দ্বারা মানুষ ও পশুপাখিকে অনেক বেশি পরিমাণে প্রতারিত করতে পারে?

* * *

চোখকে বলা হয় আত্মার জানালা। এই প্রধান ইন্দ্রিয়টির সাহায্যে আমরা প্রকৃতি রাজ্যের অসংখ্য ব্যাপারকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করে থাকি। শ্রবণেন্দ্রিয় সে তুলনায় দ্বিতীয় স্থানে অধিষ্ঠিত। চোখ যা দেখেছে তার শব্দাবলী সে শ্রবণ করে মাত্র। তুমি ঐতিহাসিকই হও, কবিই হও আর জ্যোতির্বিদই হও যা তুমি চোখে দেখনি তার সম্পর্কে তোমার প্রতিবেদন কখনও বিশুদ্ধ হতে পারে না। এবং কবি তুমি যদি তোমার লেখনী দিয়ে একটি গল্প বল, মনে রেখ একজন চিত্রকর তার তুলি দিয়ে আরও সহজ ভাবে তা বলতে পারে যা হবে অনেক বেশি নিখুঁত এবং সহজেই অনুধাবনযোগ্য। তুমি যদি চিত্রকে বল বোবা, তাহলে একজন চিত্রকরও কবিতাকে অন্ধ চিত্র নামে অভিহিত করতে পারে। এখন বিবেচনা করে দেখ কোনটি বেশি খারাপ—বোবা হওয়া না অন্ধ হওয়া। কবি এবং চিত্রকর কাহিনী উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে উভয়েই স্বাধীন, তথাপি একজন কবি পাঠককে অতটা তৃপ্তি দান করতে পারেন না যতটা চিত্রকর পারেন। কারণ যদিও কবিতা বস্তুর রূপ, ক্রিয়া অথবা কোনও স্থানের বর্ণনা ভাষায় দেবার চেষ্টা করে তথাপি চিত্রকরই বর্ণিতব্যের রূপ যতদূর সম্ভব যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। ভেবে দেখ মানুষের নাম না ছবি কোনটি প্রকৃত মানুষের কাছাকাছি যায়। দেশান্তরে গেলে মানুষের নাম পাল্টে যায় কিন্তু মৃত্যু না হলে তার রূপের বিশেষ পরিবর্তন হয় না।

রাজা Mathias-এর জন্মদিনে এক কবি সেই রাজার বক্তব্য অনুযায়ী জগতের পক্ষে মঙ্গলজনক একটি ঘটনা নিয়ে কবিতা রচনা করে আনলেন আর একজন চিত্রকর তাকে উপহার দিলেন রাজার প্রিয়জনের একটি চিত্র। রাজা দ্রুত বন্ধ করে দিলেন কবিতার বই এবং ছবিটির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। কবি তখন উষ্মা প্রকাশ করে বললেন—হে রাজন্ আপনি কবিতার বইটি অনুগ্রহ করে বারংবার পড়ুন—পড়লে আপনি তার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর সত্য লাভ করতে পারবেন। ঐ বোবা ছবিটিতে আর এমন কী আছে? একথা শুনে রাজা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন: কবি তুমি চুপ করো। তুমি কী বলছ তা তুমি জানো না। তোমার রচনাটির তুলনায় এই চিত্রকর্মটি মহত্তর একটি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি দান করছে, হয়ত চক্ষুহীনদের কাছে তোমার কাজের গুরুত্ব থাকতে পারে। তুমি ত আমাকে দিয়েছ শোনার জিনিস—তুমি আমাকে এমন কিছু কি দিয়েছ যা আমি দেখতে বা ছুঁতে পারি? আমার রুচিকে তুমি অকারণ ভর্ৎসনা করো না। তোমার বইটি হাতের নিচে রেখে দিয়েছি আর দুহাতে ধরে রেখেছি ছবিটিকে দুচোখ ভরে দেখবার জন্য। আমার হাতদুটি স্বাভাবিকভাবেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের তুলনায় মহত্তর একটি ইন্দ্রিয়ের পিপাসা চরিতার্থ করার কাজ বেছে নিয়েছে। আমার নিজের মতে চিত্রকরের কাজ কবির কাব্যের তুলনায় অনেক উঁচু পর্যায়ের কারণ তার আবেদন মহত্তর একটি ইন্দ্রিয়ের কাছে। তুমি কি জানো না আমাদের আত্মা সামঞ্জস্যের অধিদেবতা? এই সঙ্গতি সুষমা তখনই সৃষ্টি হয় যখন কোনো চিত্রকরও অনুপাতিক অঙ্গগুলি একই সঙ্গে দৃষ্ট বা শ্রুত হয়। এবং তুমি কি দেখতে পাও না তোমার রচনায় একসঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি প্রতিভাত হয় না, এখানে অংশগুলি আসে পর্যায়ক্রমে—একের পর এক। পরের অংশটি জন্মই নিতে পারে না আগেরটি বিলুপ্ত না হলে। সুতরাং আমার মতে তোমার সৃষ্টি চিত্রকরের সৃষ্টির তুলনায় যথেষ্ট ন্যূন। তার প্রধান কারণ তোমার সৃষ্টিতে এককালীন কোনও সুসমঞ্জস সমগ্রতা দানা বাঁধে না। তোমার সৃষ্টি শ্রোতা বা আগ্রহীদের মনকে ততটা তৃপ্তি দিতে পারে না যতটা পারে সৌন্দর্যোপকরণের আনুপাতিক সামঞ্জস্যে রচিত এই স্বর্গীয় মুখের ছবি যেটি আমি দেখছি। আশ্চর্য এর সঙ্গতি সুষমা আমার মনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। আমার মনে হয় না পৃথিবীতে আর কোনও সৃষ্টি এর চেয়ে বেশি আনন্দ দিতে পারে।

* * *

ভাস্কর্য

ভাস্কর্যের তুলনায় চিত্রকলা অনেক বেশি মনন ও দক্ষতা দাবি করে। সেই কারণে চিত্রকলা মহত্তর। প্রকৃতির অন্তর-লোকে প্রবেশ করাতে হয় চিত্রকরের মনকে। তাকে প্রকৃতি ও শিল্পের মধ্যে নিতে হয় ভাষ্যকারের দায়িত্ব। প্রকৃতির অন্তস্থ কারণ সূত্রগুলি তাকে বুঝতে হয়, অনুধাবন করতে হয় বিশেষ করে সেই উপায়গুলি যা চোখের মণিতে প্রতিবিম্বিত হয়ে উদ্ভিন্ন বস্তুটির সত্যরূপটিকে উদ্ভাসিত করে তোলে। একই আকারের অনেকগুলি বস্তুর মধ্যে কোনটি চোখের কাছে প্রধান হয়ে ধরা দেবে সেই পার্থক্য বোধ তার থাকতে হবে; একই রকম যাদের রঙ যাদের মধ্যে কোনটি কম আলোকিত কোনটি বেশি আলোকিত হবে তা বুঝতে হবে; একই উচ্চতায় স্থাপিত অনেকগুলি বস্তুর মধ্যে কোনটিকে দেখাতে হবে বেশি উচ্চতা-সম্পন্ন তা জানতে হবে; বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত একই জিনিসের মধ্যে কোনটি হবে কম অস্পষ্ট সেই বোধ থাকা চাই।

দৃশ্য জগতের যা কিছু সবই চিত্রশিল্পের এক্তিয়ারে পড়ে। কিন্তু ভাস্কর্যের এ ব্যাপারে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন ধরা যাক বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যেসবে রঙের ঘনত্বের কমবেশি আছে বা স্বচ্ছতা আছে—সেসব ভাস্কর্যের মধ্যে আনা দুষ্কর। ভাস্কর সাধারণভাবে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির আকারগত দিকটি দেখাতে পারেন। অবশ্যই উল্লেখযোগ্য কোনও শিল্পায়ন না ঘটিয়ে। কিন্তু চিত্রকর বর্ণের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা বা দৃশ্যবস্তু ও দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী পরিবেশে হস্তক্ষেপ করে নানারকম দূরত্বের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি আঁকতে পারেন কুয়াশা যার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন বস্তুর আকারগুলি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেঘের মুকুট পড়া পাহাড় এবং উপত্যকার দৃশ্য; ধূলোর মেঘ কী ভাবে হাওয়ার মধ্যে পাক খাচ্ছে; বিভিন্ন স্বচ্ছতাযুক্ত জলস্রোত, জলের উপরিতল ও তলদেশের মধ্যে ক্রীড়ারত মাছ, নদীর স্বচ্ছ জলতলে পরিষ্কার বালির উপর শোভমান নানারঙের হুড়ি পাথর—পরিবেষ্টিত সবুজ গাছের ছায়া যে নদীর জলে এসে পড়েছে। তিনি বিভিন্ন উচ্চতায় এঁকে দেখতে পারেন তারায় ছাওয়া আকাশ এবং অসংখ্য অঙ্গাঙ্গ ব্যাপার ভাস্কর্য যা কল্পনাতে আনতে পারে না। ভাস্কর স্বচ্ছ অথবা দীপ্তিমান কোনও বস্তুকে উপস্থাপিত করতে পারেন না।

চিত্রকলা আলো ও ছায়ার সাহায্যে একটি সমান তলের উপর গর্ত ও ঢিবির উচ্চাবচ দৃশ্য আঁকতে পারেন যা দেখে মনে হবে দৃশ্যস্থ বিষয়গুলি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত।

ভাস্কর মহাশয় অবশ্যই বলতে পারেন যে basso relievo ত একধরনের চিত্রকলাই। এতে অভিক্ষিপ্তভাবে নির্মিত (উঁচু করে নির্মিত) যথানুপাতিক বস্তুরূপগুলিকে চিত্রের মতই দেখানো যায়। আলো ও ছায়ার সাহায্যে বেদের যে গভীরতা দেখানো যায় চিত্রের মধ্যে বা ভাস্কর্যের চতুষ্পার্শ্বিক বলয়ে basso relievo-তে তার অল্পই দেখানো যায়, কেননা এটা না চিত্র না ভাস্কর্য। এটা চিত্র ও ভাস্কর্যের মিশ্ররূপ।

* * *

প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মধ্যে যে বর্ণবৈচিত্র্য থাকে ভাস্কর তা দেখাতে পারেন না। চিত্রকর কিন্তু প্রতিটি খুঁটিনাটিকেই বর্ণিত করতে পারেন। ভাস্কর কোনক্রমেই আকৃতি ও অবস্থানানুযায়ী কোন কিছুর দর্শনানুপাতকে বিশ্বাস্য করে তুলতে পারেন না। চিত্রকর তাঁর কাজের মধ্যেই রচনা করতে পারেন শত মাইলের প্রেক্ষিত। আকাশীয় কোন পরিমণ্ডল রচনা ভাস্করের সামর্থ্যের বাইরে। তাঁরা স্বচ্ছ বা দীপ্তিমান, প্রতিবিম্বিত বা আয়নার মত উজ্জ্বল বা চকচকে তলবিশিষ্ট কোন কিছু ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। কুয়াশা বা খারাপ কোন আবহাওয়া তাদের পক্ষে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। এরকম অসংখ্য সব ব্যাপার আছে বাহুল্যের ভয়ে যার উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি। তবে ভাস্কর্যের পক্ষে বলবার মত একটি কথা আছে—সময়কে জয় করার ক্ষমতা তার বেশি। চিত্রকলা যেখানে অনেক বেশি সুন্দর, কল্পনাধন্য এবং সমৃদ্ধ একটি শিল্পমাধ্যম ভাস্কর্য সেখানে কিছু বেশিদিন টেঁকে এই মাত্র।

চিত্রশিল্পকে মনে হয় আশ্চর্য এক দৈবকলা। বিমূর্ত জিনিসকে সে মূর্ত করে তোলে, সমতলে নিয়ে আসে উচ্চাবচের রূপ, দূরকে সে এনে দেয় হাতের নাগালে। অনন্ত সম্ভাবনায় অলঙ্কৃত একটি শিল্পের নাম চিত্রকলা—ভাস্কর্যের পক্ষে কখনোই তাকে টেক্কা দেওয়া সম্ভব নয়।

সংকলন ও অনুবাদ—**শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়**

লীলা রায়

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯২ সংখ্যায় সদ্যপ্রয়াত মনস্বিনী লেখিকা শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের বিষয়ে শ্রীযুক্তা শ্যামশ্রী লালের প্রবন্ধটি পড়ে খুবই ভালো লাগল। তবে প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেছেন,—'ইউরোপে থাকার সময়ে অন্নদাশঙ্কর মণীন্দ্রলাল বসুকে বন্ধুরূপে পান এবং সেই বন্ধুত্ব মণীন্দ্রলালের জীবনাবসান অবধি থেকে যায়।'

আমরা কিন্তু জানি বিদেশে যাওয়ার আগে, ছাত্র জীবনেই তাঁরা বন্ধু ছিলেন। মণীন্দ্রলাল তখন থাকতেন ৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রিটে। তাঁর মেজকাকা স্বনামধন্য চিকিৎসক, 'ভারতে রসায়ন শিল্পের জনক' হিসাবে খ্যাত, এবং Bengal Chemical-এর প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসুর নাম সর্বজনপরিচিত। তাঁর তিরোধানের পর ৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রিটের ঐ বাড়িতে ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ডাঃ বসুর ল্যাবরেটরির সুপ্রশস্ত হল্ ঘরে প্রতি বৎসর কার্তিক সংক্রান্তি দিনে ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসুর জন্মোৎসব পালিত হত। সে সভায় বহু মনীষী সভাপতিত্ব করতে আসতেন। একবার স্বয়ং অন্নদাশঙ্করও এসেছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—'বঙ্গ'-র (মণীন্দ্রলালের ডাকনাম) সঙ্গে এ বাড়িতে বহুবার এসেছি। দূর থেকে কর্মবীর কার্তিকচন্দ্রকে দেখেছি, কিন্তু কোন দিন তাঁর কাছে যাবার সুযোগ হয়নি। কারণ তিনি ছিলেন সদাব্যস্ত এক মহাকর্মী মানুষ, আর আমরা তখন কলেজের পড়ুয়া।

মণীন্দ্রলাল যখন ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাতে যান, অন্নদাশঙ্কর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যান সিভিলিয়ান হবার জন্য। সেখানেও তাঁদের সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষ বয়সে PEN-এর দুই বন্ধু (মণীন্দ্রলাল ও অন্নদাশঙ্কর) নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্তা লীলা রায়কে শান্তিনিকেতনে দেখেছি অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের এক কন্যার বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা নিখুঁত ভাবে পরিচালনা করে প্রবোধচন্দ্রের পত্নী শ্রীমতী রুচিরা দেবীকে সহায়তা করতে। হিন্দু বিবাহের মাঙ্গলিক ব্যবস্থাও যে তাঁর নখদর্পণে ছিল এটাও বলবার মত কথা। 'রবিবাসরে' সাহিত্য সভায় অন্নদাশঙ্করের সংবর্ধনায় লীলাদিও এসেছিলেন। আর শেষ দেখলাম তাঁর বনফুল পুরস্কার প্রাপ্তি সভায় অনবদ্য বাংলায় প্রত্যাভিভাষণ দিতে—যার আরম্ভ করেছিলেন সভাপতি রাজ্যপালের বুঝবার সুবিধার জন্য—ইংরেজিতে। সেই অভিভাষণে কিছু নিজের কথাও বলেছিলেন—তার কিছুটা তুলে দিচ্ছি :

"লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরিয়ান আমায় আলাপ করে দেন ডঃ ভবানী ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ভবানী (তখন) তরুণ বাঙ্গালী লেখক। তিনি আমায় বলেন—ইংরেজিতে লিখবেন। বাঙ্গলা লিখে যদিও নাম করেছেন। বাঙ্গলা আর লিখবেন না। তাঁর এক বন্ধুকে আমার পরিচয় দিয়ে তাঁকে আমার দেখাশোনা করতে অনুরোধ করলেন। তাঁর সেই বন্ধু আমার দেখাশোনা করছেন এখনও। তাঁর নাম অন্নদাশঙ্কর রায়।

"বাঙ্গলা লেখা বিয়ের আগে থেকে শুরু হল। আমার কাছে বাঙ্গলা সাহিত্য এক নতুন জগৎ। অজানা, রহস্যময়, সুন্দর। সেখানে ঘুরে বেড়াই। দেখি শুনি পড়ি এবং এই জগতে যাদের প্রবেশ নেই তাদের জন্য একটু অনুবাদ করি। ছয় দশক হয়ে গেল। বছরগুলো দিনের মতো চলে গেছে।"

তাঁর সমগ্র রচনাটি 'রবিবাসর' বার্ষিক সংকলন গ্রন্থের ১৪ খণ্ডে প্রকাশ করেছিলাম। নিবেদক—

সন্তোষকুমার দে

সম্পাদক : রবিবাসর ১৪৬ কে. এন. সেন রোড, কল-২৮

কোরআনে নারীর মর্যাদা

বিতর্কিত বাংলাদেশী কবি ও কলাম লেখিকা তসলিমা নাসরিনের নির্বাচিত কলাম বিষয়ক বিজলী সরকারের নিবন্ধে ('চতুরঙ্গ', সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯২) উল্লিখিত কোরআন শরিফের উদ্ধৃতিটি সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন মনে করলাম।

কোরআন শরিফে মোট ৬৬৬৬টি আয়াত বা আরবি বাক্য বর্তমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক একটি আয়াতকে

বাংলা অনুবাদে দুই বা ততোধিক বাক্যে খণ্ডিত করা হয়ে থাকে। তাই বাংলা অনুবাদের সম্পূর্ণ একটি বাক্য দ্বারা অর্থ বা ভাবের প্রকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাছাড়া কোরআন শরিফের অধিকাংশ আয়াত পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কিংবা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় আয়াতের উপর, ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল হওয়ায়—কেবলমাত্র একটি আয়াতের বাংলা অনুবাদের দ্বারাও বক্তব্য পরিস্ফুট হয়না বরং অনেক ক্ষেত্রে অর্থের বিকৃতিও ঘটার সম্ভাবনা। বেদ, পুরাণ, বাইবেল বা গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদে এধরনের কোন জটিলতা আছে কিনা তা আমার অজানা!

নিবন্ধ লেখিকা কোরআনের যে উদ্ধৃতিটি নিবন্ধে তুলেছেন—তা কোরআনের 'নিসা' নামক সুরার (সুরা অর্থাৎ পরিচ্ছেদ, কোরআনে মোট সুরা ১১৪) ৩৪ নং আয়াত বা আরবি বাক্যের ভগ্নাংশের অনুবাদ মাত্র। 'হরফ' প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত মাওলানা মোবারক করীম জওহর কর্তৃক অনূদিত 'কোরআন শরীফে' ঐ ৩৪ নং বাক্যটিকে ৬টি বাংলা বাক্যের মাধ্যমে অনুবাদ করা হয়েছে। লেখিকা মহোদয়া ৩৪নং আরবি বাক্যের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ তো দূরের কথা—বাংলা অনুবাদের প্রথম বাক্যটিও সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। তিনি উদ্ধৃতিটির যেখানে পূর্ণচ্ছেদ (।) ব্যবহার করেছেন—প্রকৃত পক্ষে মূল অনুবাদে সেখানে কমা (,) আছে এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় কমা-পরবর্তী-বাক্যাংশটি হল কমা পূর্ববর্তী-বাক্যাংশের উপর একান্তরূপে নির্ভরশীল। সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি হল—

"পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, এবং (শ্রেষ্ঠত্ব) এ জন্য যে পুরুষ তাদের জন্য ধন ব্যয় করে।"

লেখিকা কর্তৃক উদ্ধৃত কোরআনের উক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছিল—ইসলাম ধর্মে পুরুষ জন্মজন্মান্তর ধরে সর্ব-বিষয়ে নারীর উপর প্রভুত্ব করবে। অপরদিকে বাক্যটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটিতে এক বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে উক্ত বিষয়ে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব বহাল করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই উপোরোক্ত উদ্ধৃতির এক চমৎকার ও সাহসী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন বোম্বাইয়ের INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES-এর অধিকর্তা, সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ক প্রখ্যাত গবেষক Dr. Asgar Ali Engineer মহাশয়, হুবহু ইংরেজি আলোচনাটি তুলে দিলাম—

Thus the reason for man's superiority over women is clear. Man earns and spends from his property for looking after her and it is Allah's prerogative to give status to one over the other. However, Allah, as is clear from the above verse, does not exercise this prerogative arbitrarily. The criterion of according status to one over the other is clearly laid down, at least in this case. One who earns and supports the other has superiority. If, instead of man, woman starts earning (there is no prohibition in this respect in the Quran) and supporting the family, Allah would accord her the superior status and if both the husbsand and wife earn to supplement the family income neither shall have status over the other. In other words both shall enjoy equal status. Of course the traditional 'ulama', who have very closely imbibed the patriarchal values would never agree to this formulation as in keeping with the spirit of the Quran. The Quranic vision is transcendent and cannot be informed of the value of any particular age only.

[সূত্র : *Status of Women, editor :* Dr.Sushila Agrawal, Jaipur, 1988, Page. 66]

নিবেদক—
শেখ একরামুল হক
সুরাট গুজরাট।

শম্ভু মিত্র এবং প্রচার মাধ্যমের অবহেলা

ধন্যবাদ সম্পাদককে, ধন্যবাদ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সাম্প্রতিককালে যে ক'জন

বাঙালি বাংলার সাংস্কৃতিক জগৎকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন শম্ভু মিত্র তাঁদের অন্যতম। কিন্তু যে কারণেই হোক, কিছু নাট্যামোদী ছাড়া, সাধারণ মানুষের কাছে তিনি অনেকটাই অন্তরালবর্তী। প্রচারমাধ্যমের অবহেলা তার অন্যতম কারণ। সত্যজিৎ রায় নিঃসন্দেহে কৃতী পুরুষ ছিলেন, বাংলা তথা ভারতের সম্মান বহির্বিশ্বের কাছে তিনি তুলে ধরেছিলেন। মৃত্যুর আগে এবং মরোণোত্তরভাবে যে সম্মান তিনি সারা পৃথিবীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন একজন বাঙালি হিসেবে তাতে গর্ববোধ করি। তবু মনে হয় দূরদর্শন সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে যত অনুষ্ঠান করেছেন শম্ভু মিত্র সেই তুলনায় অবহেলিত। সত্যজিতের সৃষ্টিমাধ্যমে এমনই যা স্বাভাবিকভাবেই আগামী প্রজন্মের হাতে পৌছে যাবে। কিন্তু এত বছরের মধ্যেও শম্ভু মিত্রের অভিনীত নাটকের রেকর্ডিং বা নাট্য আলোচনায় তাঁর মতামত সংগ্রহের কোন প্রচেষ্টা দূরদর্শনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে জানা যায় নি। তাঁর অবর্তমানে তিনি আগামী নাট্যামোদীদের কাছে শুধু একটি Legend হয়েই বেঁচে থাকবেন, আর থাকবেন তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু নাটক এমনই একটি আঙ্গিক যা শুধু বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে না। বিশেষতঃ সংরক্ষণের একটা সুযোগ যখন আমাদের হাতে রয়েছে তখন এই ঔদাসীন্য আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা ও ইতিহাসচেতনার অভাবই সূচিত করে।

নিবেদক—
অনীশ কুমার লাহিড়ী
নিউ জি. পি.
ব্লক ১২, কো: নং ৩৪৫
জি. আই. পি. কলোনী,
হাওড়া-৭১১.৩২১

WITH BEST COMPLIMENTS

"TO BUILD A BETTER TOMORROW D.T.M. OFFERS
A WIDE RANGE OF CIVIL ENGINEERING AND
MANUFACTURING SERVICES UNDER ONE ROOF"

SPECIALISED IN THE CONSTRUCTION AND ERECTION OF :—

- MATERIAL HANDLING PLANTS
- LPG BOTTLING PLANTS
- 400 KV SUBSTATION & SWITCHYARD FOUNDATION
- MULTISTORIED BUILDING
- HOUSING COMPLEXES
- BRIDGE & ROADS
- FACTORY BUILDING & SHEDS
- GAS TURBINE PROJECTS
- MANUFACTURING OF PRE-STRESSED CONCRETE POLES
- DREDGING OF LAKES, CANALS, WATER RESERVOIR & RIVER BEDS
- HEAVY EQUIPMENTS FOUNDATION
- AND GOVERNMENT PROJECTS

D. T. M. Construction Private Limited

CIVIL ENGINEER, CONTRACTORS AND MASTER DREDGERER

City Office :
59B CHOWRINGHEE ROAD
(5th Floor)
CALCUTTA-700 020
Phone - 40-3165, 40-3093
Telex - 021-5294 ANIP IN

Registered Office :
1 MANGOE LANE
(2nd Floor)
CALCUTTA-700 001
Phone-20-0194
Cable : COLBEAM

25 YEARS' DEDICATED SERVICE TO THE NATION